সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

আগস্ট ২০১৬

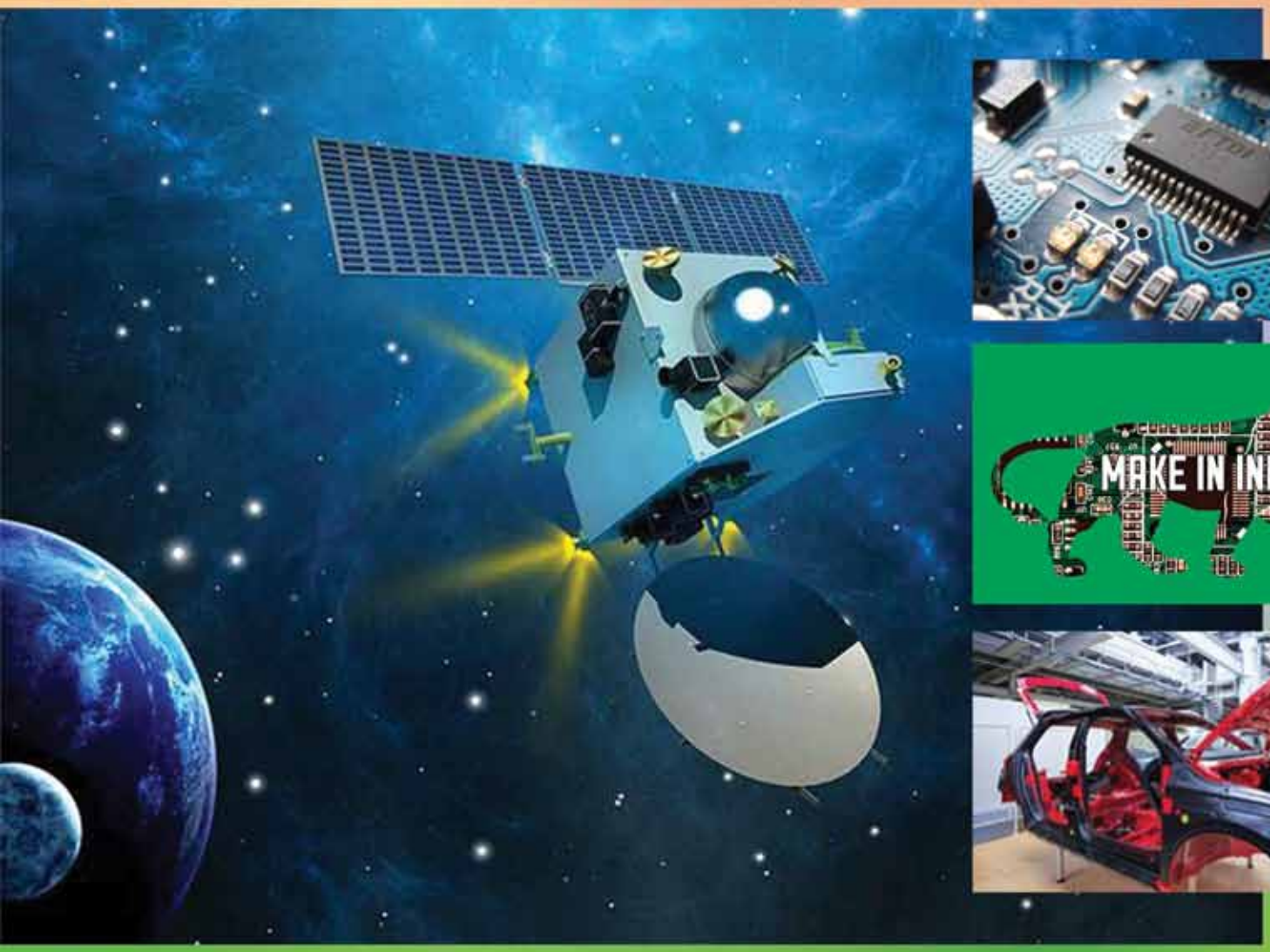

ভারত ॥ বর্ণে-বিভায় সত্তরের পথে পা...

উপরে

১. ২১ জুলাই ২০১৬ ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় শেখ হাসিনা এক যৌথ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পেট্রাপোল ইনটেগ্রেটেড চেক পোস্ট (আইসিপি)-এর উদ্বোধন করেন

২. ঢাকায় পেট্রাপোল ইনটেগ্রেটেড চেক পোস্ট (আইসিপি)-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ভিডিও কনফারেন্সে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় শেখ হাসিনার সঙ্গে ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা

৩. ০৭ জুলাই ২০১৬ বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আবদুল হামিদের সঙ্গে ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা পবিত্র ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা বিনিময়

উপরে

২৮ জুন ২০১৬ হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা এবং ভারত সরকারের অতিরিক্ত সচিব ফিন্যান্স ও বিদেশ মন্ত্রকের অর্থবিষয়ক উপদেষ্টা ড. সুমিত জেরাটের মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে ভারতীয় সহায়তাপুষ্ট মণিপুরী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র পরিদর্শন

উপরে

১. ০৪ জুলাই ২০১৬ বনানীর আর্মি স্টেডিয়ামে ঢাকায় ক্যাফে আক্রমণে শিকারদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

২. ০৬ জুলাই ২০১৬ শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার ইস্কন জগন্নাথ মন্দির, স্বামীবাগ আশ্রমে রথযাত্রা উৎসবের উদ্বোধন এবং অংশগ্রহণ

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

বর্ষ চুয়াল্লিশ | সংখ্যা ০৭ | শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪২৩ | আগস্ট ২০১৬

www.hcidhaka.gov.in
Facebook page: /IndiaInBangladesh; @ihcdhaka
IGCC Facebook page: /IndiraGandhiCulturalCentre

Bharat Bichitra
Facebook page: /BharatBichitra

ভারত মাতালো *সুরের ধারা*

পৃষ্ঠা: ২২

সূ চি প ত্র

কর্মযোগ	পেট্রাপোল সমন্বিত চেক পোস্টের উদ্বোধন ০৪ ‘এ মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না...’ ০৫ রামপালে মৈত্রী সুপার থারমাল পাওয়ার প্ল্যান্টের চুক্তি স্বাক্ষর ০৬
প্রচ্ছদ রচনা	ভারত ॥ বর্ণে-বিভায় সত্তরের পথে পা... ০৭
শ্রদ্ধাঞ্জলি	ফিরে ফিরে যাঁকে দেখতে হয় বারে বারে ॥ জাহানারা নওশিন ১১ নিন্দা ও নান্দির রবীন্দ্রনাথ ॥ গাজী আজিজুর রহমান ১৬ কাজী নজরুল ইসলাম: স্বতন্ত্র অবলোকন ॥ মলয়চন্দন মুখোপাধ্যায় ১৯
সৌহার্দ	ভারত মাতালো *সুরের ধারা* ॥ দীপক পাল ২২ ভারতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ৩৬
কবিতা	শ্বেতা শতাব্দী এষ ॥ অভিজিৎ বিশ্বাস মলয়চন্দন সাহা ॥ শিহাব সরকার ২৪ নুরুল ইসলাম বাবুল ॥ রবিউল হুসাইন ॥ অপর্ণা পাণ্ডে চিন্ময় কর ২৫
আরশিনগর	ভারতবিহার বৃত্তান্ত ॥ মো. আল-আমিন ২৬
ছোটগল্প	মাঝরাতে নিঃশব্দ করাত ॥ সুজন হাজারি ২৮
ধারাবাহিক	পাসিং শো ॥ অমর মিত্র ৩২ চিলিকা হ্রদের দেশে ॥ দীপিকা ঘোষ ৪৪
রাজ্য পরিচিতি	ত্রিপুরা ৩৮
শেষ পাতা	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৮

০৭

ভারত ॥ বর্ণে-বিভায় সত্তরের পথে পা...

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতীয় উৎপাদন খাতকে পুনরুজ্জীবিত করতে এক নতুন স্লোগান তোলেন, ‘আসুন, ভারতে তৈরি করুন।’ বিশ্লেষকরা শ্রী মোদীর এই আগ্রাসী প্রচেষ্টা ইন্ডিয়া ইনকর্পোরেটেড এক-জানালামুখী ছাড়পত্র, ন্যূনতম প্রক্রিয়া ও লালফিতার দৌরাত্ম্যহীন ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ (ভারতে তৈরি করুন)-কে কর্মসংস্থান, প্রবৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ গতিসঞ্চার হিসেবে দেখছেন। এই বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের পর থেকে ভারত সরকার উৎপাদন, নকশা, উদ্ভাবন ও আরম্ভের ক্ষেত্রে গতিবেগ সঞ্চারের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে বিভিন্ন সংস্কারমূলক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।

সম্পাদক নান্টু রায়
ফোন ৯৮৫০১৯৩-৭, ৯৮৮৮৭৮৯-৯১ এক্স: ১৪৯
ফ্যাক্স ৮৮-০২-৯৮৮২৫৫৫
e-mail: informa@hcidhaka.gov.in

শিল্প নির্দেশক ধ্রুব এষ
গ্রাফিক্স মো. রেদওয়ানুর রহমান

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ভারতীয় হাই কমিশন
বাড়ি নং ২ সড়ক নং ১৪২ গুলশান-১ ঢাকা-১২১২

মুদ্রণ ডটনেট লিমিটেড
৫১/৫১এ পুরানা পল্টন ঢাকা-১০০০ ফোন ৯৫৬২১৯৮

ভারতীয় জনগণের শুভেচ্ছাসহ বিনামূল্যে বিতরিত ভারত বিচিত্রায় প্রকাশিত সব রচনার মতামত লেখকের নিজস্ব– এর সঙ্গে ভারত সরকারের কোন যোগ নেই
এই পত্রিকার কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে ঋণস্বীকার বাঞ্ছনীয়

পাঠকের পাতা

অস্থিরতা অনুভব করছি

আমি একজন চাকরিজীবী। ইতোপূর্বে আপনার দফতর থেকে প্রকাশিত *ভারত বিচিত্রা* পত্রিকা নিয়মিতভাবে পেতাম। কিন্তু দীর্ঘদিন হল পত্রিকাটি আমার নামে আসা বন্ধ। এক বন্ধুর কাছে পত্রিকাটি দেখে আমার মন-প্রাণ জুড়িয়ে গেল। আগের চেয়ে শতগুণ পরিচ্ছন্ন পত্রিকা এবং নতুন আঙ্গিকে ছাপা দেখে আমি নিজের নামে পত্রিকাটি পেতে অস্থিরতা অনুভব করছি। আশা করি নতুন তালিকাভুক্তিতে আমাকে স্থান দেবেন।

ভারতের বড় বড় সাহিত্যিকের গল্প উপন্যাসসহ ছোটগল্প নিয়মিত আশা করি। বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম, ভারতের অভূতপূর্ব উন্নয়নের ধারাবাহিক ফিচার, ডাক টিকিট, পত্র-পত্রিকা ও ভাল ভাল বইয়ের নাম, বর্ণনা এবং এগুলো ঢাকাতে বিক্রি হলে কোথায় পাওয়া যায়, তার ঠিকানা, বিভিন্ন শিল্পমাধ্যমের খ্যাতিমানদের জীবনের কঠোরতম সাধনায় যে-সব প্রতিষ্ঠান আজ বিশ্বজোড়া নাম করেছে, সে-সব প্রতিষ্ঠানের বিবরণী, পররাষ্ট্রসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতের সাফল্য ও অগ্রগতি, শাসন বিভাগ, নির্বাচনী কর্মকাণ্ডে সুষ্ঠুতা প্রভৃতি বিষয় আমার মনকে দোলা দেয়। এসব বিষয়ে *ভারত বিচিত্রায়* নিয়মিত লেখা প্রকাশের আশা রেখে শেষ করছি।

মো. আবদুল লতিফ
প্রযত্নে আহাম্মদ আলী
গ্রাম: চেঁচুয়া, দরগাপাড়া, পোস্ট: জগতি, কুষ্টিয়া

অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক

আমি বরিশাল বার সমিতির একজন আইনজীবী। কিছুদিন আগে আপনার সম্পাদিত *ভারত বিচিত্রার* কয়েকটি সংখ্যা পড়ার সুযোগ পেয়ে মুগ্ধ হই। এতে প্রকাশিত গল্প, প্রবন্ধ, ঐতিহাসিক স্থানের বর্ণনা, মনীষীদের জীবনী, ধর্মীয় আলোচনা আমার কাছে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক মনে হয়েছে। হঠাৎ, মার্চ ২০১৬-এর একটি বিচিত্রা কয়েকদিন আগে সৌভাগ্যক্রমে পেয়ে জানতে পারলাম নতুন গ্রাহক অন্তর্ভুক্তির কাজ চলছে। তাই ভাবলাম লিখে দেখি প্রিয় *ভারত বিচিত্রার* গ্রাহক হতে পারি কিনা।

এমতাবস্থায়, আমাকে নতুন গ্রাহক-তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে নিয়মিত প্রিয় *ভারত বিচিত্রা* পড়ার সুযোগদানে বাধিত করবেন।

এ্যাডভোকেট নন্দিতা দাস
প্রযত্নে: অজিতকুমার দাস
আয়কর আইজীবী, নক্ষত্র ভবন
কাউনিয়া ক্লাব রোড, বরিশাল-৮২০০

চল্লিশোর্ধ পত্রিকা

আমি আপনার সম্পাদিত প্রকাশিত *ভারত বিচিত্রার* একজন নিয়মিত পাঠক। সর্বশেষ আমি পত্রিকাটির মার্চ ২০১৬ সংখ্যাটি হাতে পেয়েছি। সুদীর্ঘ ২৫ বছরেরও অধিক সময় ধরে এই সুন্দর পত্রিকাটি আমি পাঠ করে আসছি নিয়মিতভাবে। যদিও মাঝে-মধ্যে ২/১টি সংখ্যা হাতে পাইনি। তথাপি ঐ না-পাওয়া সংখ্যাগুলো বিভিন্নভাবে সংগ্রহ করে পড়েছি। বর্তমানে চল্লিশোর্ধ পত্রিকাটি সবদিক থেকে যথেষ্ঠ উন্নত। সম্প্রতি *ভারত বিচিত্রার* গ্রাহক তালিকা হালনাগাদ করার জন্য গ্রাহকদের (মুদ্রিত সংস্করণ পেতে ইচ্ছুক) নাম ও অন্যান্য তথ্য পাঠাতে অনুরোধ জানিয়ে আপনারা যে ফরম পাঠিয়েছেন, আমি তা পূরণ করে পাঠালাম।

আমি ২০১৫ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ– এই সংখ্যা ৩টি হাত পাইনি। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও সংগ্রহ করতে পারিনি। দয়া করে ঐ সংখ্যা ৩টি পাঠালে কৃতজ্ঞ থাকব।

ভারত বিচিত্রার সংশোধিত নতুন গ্রাহক তালিকায় আমার নাম অন্তর্ভুক্ত করে পত্রিকাটি নিয়মিত পড়ার সুযোগ দেয়ার জন্য বিশেষ আবেদন জানাচ্ছি।

সুশান্তকুমার ভাদুড়ী
ছোট বয়ারা (ডাক্তারপাড়া), খুলনা

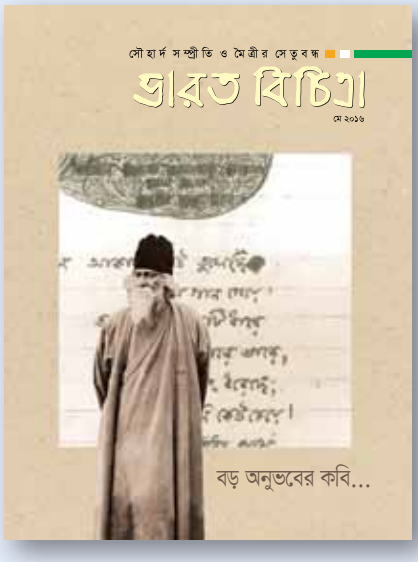

খুব শিক্ষণীয়

আমি একজন সরকারি প্রাইমারী স্কুলের সহকারী শিক্ষিকা। ইতোপূর্বে একজনের কাছ থেকে আপনাদের প্রকাশিত মাসিক *ভারত বিচিত্রাটি* ধার নিয়ে নিয়মিত পড়তাম। কিন্তু দীর্ঘদিন যাবৎ তার নামে পত্রিকা না আসায় আমার পড়ায় ছেদ ঘটেছে। পত্রিকাটি আমার খুব প্রিয়। এতে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক খবরাখবরসহ ছোটগল্প, ধারাবাহিক উপন্যাস, অনুবাদ গল্প, সম্পাদকীয় প্রভৃতি খুবই শিক্ষণীয় ছিল।

জানতে পারলাম নতুনভাবে *ভারত বিচিত্রার* গ্রাহক রেজিস্ট্রেশন করা হচ্ছে। আশা করি আমার নামটা অন্তর্ভুক্ত করে নিয়মিত পত্রিকা পাঠাবেন।

ভারতের প্রতিটি রাজ্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস, শিল্প, সাহিত্য, পর্যটন স্পট, মানুষের জীবনযাত্রা তুলে ধরতে পারলে পত্রিকাটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে বলে আমি মনে করি। নিয়মিত ডাকটিকিট সংগ্রহকারীদের পাতা বরাদ্দ, বাঙালি বা খ্যাতিসম্পন্ন লেখকদের নতুন নতুন বই সম্পর্কে আলোচনা, রেডিও সময়সূচী, বড় বড় মানুষদের জীবনী নিয়মিতভাবে প্রকাশ করলে ভাল হয়। ভারতের ফার্স্ট লেডি শুভ্রা মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে রচনা আশা করি। প্রতি সংখ্যায় বিভিন্ন প্রদেশের নামী দামী লেখকদের বেস্ট সেল্‌স বইয়ের বাংলা অনুবাদ নিয়মিত ছাপানোর অনুরোধ রইল।

আয়েশা নাজনীন সহকারী শিক্ষক
চেঁচুয়া (মাজার শরিফ)
পোস্ট: জগতি, জেলা: কুষ্টিয়া

সংশোধন ॥ ভারত বিচিত্রা মে ২০১৬ সংখ্যা

ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখার্জির সঙ্গে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম, বন ও পরিবেশমন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাই কমিশনার সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী এবং তারিন হোসেনের সৌজন্য সাক্ষৎ

সম্পাদকীয়

বৃষ্টিস্নাত ভোরের আকাশ ঝকঝকে। হৃদপিণ্ডে ভরে নেবার উপযুক্ত নির্মল ঝিরঝিরে বাতাস। একটু পরে পূর্বদিগন্তে রক্তলাল সূর্য উঠল। না, বৃষ্টির আর সম্ভাবনা নেই। পরিবেশ বিপর্যয়ের ফলে মরসুমি বাতাসের কারসাজিতে ভরা বর্ষায়ও এবার বৃষ্টির জন্যে হা-পিত্যেশ করতে হচ্ছে। অথচ সেদিনের বাইশে শ্রাবণে আকাশ মুখ ভার করে ছিল– বাংলা রেনেসাঁর স্বর্ণফসল রবীন্দ্রনাথের শারীরিক অবস্থা মোটেই সুবিধের নয়। বড় ধরনের অস্ত্রোপচার হয়েছে, কবি অবশ্য চাইছিলেন না, কিন্তু নবীন ডাক্তারের দল নাছোড়– তারা বলল, সামান্য হার্নিয়ার অপারেশন করলেই সুস্থ হয়ে উঠবেন কবি। এরকম কত অপারেশন আমরা রোজ করি। সবাইতো কবিকে সুস্থ দেখতে চান। প্রবীণ চিকিৎসক নীলরতন ধর অবশ্য বললেন, তোমরা ভুলে যেও না, মানুষটা রবীন্দ্রনাথ– এলেবেলে কেউ নয়। কিন্তু কবির দ্রুত আরোগ্যের স্বার্থে অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্তই বহাল হল। সকাল ১০টার দিকে কবিকে নিয়ে যাওয়া হল অপারেশন টেবিলে। অপারেশন সফল। কিন্তু তার কিছুক্ষণ পরেই হিক্কা উঠতে শুরু করল– কবি আমাদের ছেড়ে অনন্তলোকে পা বাড়ালেন। তখন কলকাতার আকাশে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামল। শ্রাবণ মেঘের বাদলঘন দিনে কবি চলে গেলেন পরপারে। তখন গঙ্গায় বান ডেকেছে।

কতদিন হয়ে গেল। ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট। ২২শে শ্রাবণ ১৩৪৮। বর্ষপঞ্জির হিসেবে পৌনে এক শতাব্দী। তবু মনে হয় গতকালের ঘটনা যেন এটা। কেন এমন হয়? উত্তরটা আমাদের খুব জানা। রবীন্দ্রনাথ আমাদের জীবনে এত প্রাসঙ্গিক, তাঁকে ছাড়া আমাদের এক মুহূর্ত চলে না। তাঁর গান আমাদের নিমজ্জিত করে রাখে; ছোটগল্প আমাদের জীবনের মানে খুঁজতে সাহায্য করে। তিনি আমাদের জীবনের ধ্রুবতারা। শ্রাবণ গড়িয়ে ভাদ্র এল। আমাদের জীবনে আরেকটি মৃত্যুক্ষণ এগিয়ে এল। ১২ই ভাদ্র ১৩৮৩। আমাদের শোকস্তব্ধ করে চলে গেলেন চিরবিদ্রোহী দুখু কবি– আমাদের প্রিয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। কত মৃত্যুশোকের মধ্য দিয়ে আমাদের প্রতিদিন যেতে হয়, কিন্তু ২২শে শ্রাবণ, ১২ই ভাদ্রের কথা আমরা ভুলতে পারি না। সেই শোক সেই ২২শে শ্রাবণ আর ১২ই ভাদ্রে আমরা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি আমাদের দুই মহান কবিকে।

কিন্তু আগস্ট মাস আমাদের আরেকটি ঐতিহাসিক ঘটনার কথা মনে করিয়ে দেয়। ভারতের স্বাধীনতা আসে এ মাসেরই ১৫ তারিখে, ১৯৪৭ সালে। সেদিন ভারতবাসী শোকে-সন্তাপে, আনন্দ-উচ্ছ্বাসে বরণ করে নেন দিনটি। মধ্যরাতে যখন জগৎ সুষুপ্তিমগ্ন, তখন এক নতুন দেশ জেগে উঠছে পৃথিবীর মানচিত্রে। আজ সেই অদম্য, বর্ণে-বিভায় উজ্জ্বল দেশটি সত্তর বছরে পা রাখতে চলল। শিক্ষা বিজ্ঞান প্রযুক্তি সামাজিক উন্নয়নে নতুনের বার্তাবাহী চিরজাগ্রত ভারতের জয় হোক।

পেট্রাপোল সমন্বিত চেক পোস্ট-এর উদ্বোধন

২১ জুলাই ২০১৬ ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় শেখ হাসিনা এক যৌথ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পেট্রাপোল সমন্বিত চেক পোস্টের পেট্রাপোল ইনটেগ্রেটেড চেক পোস্ট (আইসিপি)-এর উদ্বোধন করেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সুশ্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও কলকাতা থেকে এ ভিডিও কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেন।

পেট্রাপোল-বেনাপোল ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থল সীমান্ত পারাপার। ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্যের প্রায় ৭০-৮০ শতাংশ পেট্রাপোল দিয়ে পার হয়। পেট্রাপোলে প্রায় ৫০০ কোটি ডলারের বাণিজ্য হয়ে থাকে, যা অন্য সব ভারতীয় স্থল বন্দর ও স্থল কাস্টমস স্টেশনের চেয়ে বেশি। প্রতি বছর প্রায় ১২ লাখ লোক ও দেড় লাখ ট্রাক পেট্রাপোল-বেনাপোল দিয়ে পার হয়।

পেট্রাপোল আইসিপি নিরাপত্তা, বহির্গমন, কাস্টমস, আলাদাকরণ প্রভৃতি কাজকর্ম কার্যকরভাবে ও দক্ষতার সঙ্গে করার জন্য যে সুযোগ-সুবিধা দরকার, তার অবকাঠামোগত অচলাবস্থা দূর করবে। অন্যদিকে লোকজন, পণ্য ও পরিবহনের সীমান্ত পারাপারেও সহায়তা দান করবে।

পেট্রাপোল আইসিপি হবে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের দ্বিতীয় সমন্বিত চেকপোস্ট (আগরতলা-আখাউড়া স্থল বন্দরের আগরতলা আইসিপি-র পর) এবং ভারতীয় সীমান্তসমূহের অন্য যে কোন জায়গার চেয়ে বৃহত্তর বলে ধরে নেয়া যায়। এটি হবে দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড় স্থল বন্দরও। পেট্রাপোলের পর মেঘালয়ের ডাউকিতে পরবর্তী এলসিএস মানোন্নয়ন করা হবে– এখানে জমি অধিগ্রহণের কাজ শেষ হয়েছে।

ধারণা করা হচ্ছে, পেট্রাপোল আইসিপি চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এর সামর্থ্য দ্বিগুণ হয়ে যাবে এবং পরিবহন সময় ও খরচ বেঁচে যাওয়ায় স্থানীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায় প্রভূত লাভবান হবেন। পেট্রাপোল আইসিপি চালুর ফলে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বৃহত্তর অর্থনৈতিক সমন্বয় ও সংযোগ বৃদ্ধি ফলপ্রসু হবে।

● নিজস্ব প্রতিবেদন

ভেড়ামারা কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট

২৩ জুলাই ২০১৬ কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় ৩৬০ মেগাওয়াট ভেড়ামারা কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের বিশেষজ্ঞ ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে বৈঠক

‘এ মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না...’

‘এ মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না...’ এমন উচ্চারণ একজন কবির। আজ বাংলাদেশে প্রতিদিনের অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুমিছিল দেখে শিউরে উঠতে হচ্ছে। তবু বিশ্বাস করি, একদিন এসবের অবসান হবে। ১ জুলাই ২০১৬-র রাতে গুলশানের হলি আর্টিজান বেকারিতে হামলা চালায় জঙ্গিরা। ঐ রাতে অভিযান চালাতে গিয়ে পুলিশের দুই কর্মকর্তা নিহত হন। পরদিন সকালে সেনা কমান্ডোদের নেতৃত্বে সমন্বিত অভিযানে পাঁচ জঙ্গিসহ ছয়জন নিহত হয়। সেখান থেকে ১৭ বিদেশিসহ ২০ জনের লাশ উদ্ধার করা হয়। অভিযানের আগে পরে উদ্ধার করা হয় দেশি-বিদেশি ৩২ জনকে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী তাৎক্ষণিক বার্তায় বাংলাদেশের পাশে দাঁড়াবার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে বলেন– ‘এই শোকের মুহূর্তে ভারত বাংলাদেশী ভাইবোনদের পাশে দাঁড়িয়েছে। ঢাকার হামলা আমাদের অবর্ণনীয় বেদনা দিয়েছে। আমি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে কথা বলেছি এবং এই জঘন্য হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছি।’

ভারতের মাননীয় বিদেশমন্ত্রী শ্রীমতী সুষমা স্বরাজ ঢাকায় গুলশানের হলি আর্টিজান বেকারিতে সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বাংলাদেশের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ এইচ মাহমুদ আলী এমপিকে তাৎক্ষণিকভাবে এক চিঠি পাঠান। তিনি নিহতদের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন।

৩ জুলাই ২০১৬ বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব মো. শহীদুল হক গুলশানের হলি আর্টিজান বেকারিতে সন্ত্রাসী হামলায় ভারতীয় নাগরিক তারিশি জৈনের মৃত্যুতে শোক জানাতে হাই কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

৪ জুলাই বাংলাদেশের সরকার ঢাকায় ক্যাফে আক্রমণের শিকারদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বনানীর আর্মি স্টেডিয়ামে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিহতদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা এবং ইতালি, জাপান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মিশনের প্রধানগণও পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। নিহতদের পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি বিপুলসংখ্যক সাধারণ মানুষ তাদের শ্রদ্ধা জানাতে আসেন।

● নিজস্ব প্রতিবেদন

রামপালে নির্মাণাধীন মৈত্রী সুপার থারমাল পাওয়ার প্ল্যান্টের বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রধান প্ল্যান্ট ইপিসি চুক্তি স্বাক্ষর

১২ জুলাই ২০১৬ ঢাকায় বাগেরহাটের রামপালে নির্মাণাধীন মৈত্রী সুপার থারমাল পাওয়ার প্ল্যান্টের ২x৬৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রধান প্ল্যান্ট ইপিসি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

এ উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্টজনের মধ্যে বাংলাদেশের মাননীয় বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ, ভারতের বিদ্যুৎ সচিব শ্রী প্রদীপ পূজারী ও ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা উপস্থিত ছিলেন।

২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিআইএফপিসিএল-এর দেওয়া প্রকল্পের জন্য ইপিসি কন্ট্রাক্টর নিযুক্তির জন্য যে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করা হয়েছিল তাতে ৬টি কোম্পানির দরপত্রের মধ্যে কারিগরিভাবে যোগ্যতাসম্পন্ন ও অর্থনৈতিক-ভাবে প্রতিযোগিতামূলক হওয়ায় ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যালস্ লিমিটেড (বিএইচইএল)-কে কন্ট্রাক্টটি দেওয়া হয়।

২০১০ সালের ১১ জানুয়ারি ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বিদ্যুৎখাতে সহযোগিতা বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের পর ২০১২ সালে ঢাকায় 'বাংলাদেশ ভারত মৈত্রী বিদ্যুৎ কোম্পানি (প্রাইভেট) লিমিটেড' নামে একটি যৌথ উদ্যোগ কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০১২ সালের ২৯ জানুয়ারি ভারতের ন্যাশনাল থারমাল পাওয়ার কর্পোরেশন ও বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড বাংলাদেশের বাগেরহাটের রামপালে মৈত্রী সুপার থারনাল প্ল্যান্ট নামে ১৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি কয়লাভিত্তিক থারমাল পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণের যৌথ উদ্যোগ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে।

ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যালস্ লিমিটেড হচ্ছে ভারতের সর্ববৃহৎ ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি এবং ভারতের ৬টি 'মহারত্ন' কোম্পানির একটি। বিএইচইএল বিদ্যুৎ, সঞ্চালন, শিল্প, পরিবহন, নবায়নযোগ্য শক্তি, তেল ও গ্যাস এবং প্রতিরক্ষার মত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহে ব্যাপকভিত্তিক পণ্য, পদ্ধতি ও সেবাদানের ক্ষেত্রে নকশা, ইঞ্জিনিয়ারিং, উৎপাদন, নির্মাণ, পরীক্ষণ, নিযুক্তি ও সেবাদানের কাজে নিয়োজিত। বেলারুশ, ভূটান, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, ইরাক, কাজাখস্তান, মালয়েশিয়া, নিউজিল্যান্ড, ওমান, রোয়ান্ডা, সুদান, তাজিকস্তান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ বিশ্বের ২১টি দেশের প্রায় ১০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণে বিএইচইএল-এর সামর্থ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

● নিজস্ব প্রতিবেদন

ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজে ভারতীয় হাই কমিশনার

২৬ জুলাই ২০১৬ শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজে সমকালীন ভারত, তার পররাষ্ট্র নীতি, নিরাপত্তা কৌশল ও ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক বিষয়ে বক্তৃতা করেন

প্রচ্ছদ রচনা

ভারত

বর্ণে-বিভায় সত্তরের পথে পা...

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতীয় উৎপাদন খাতকে পুনরুজ্জীবিত করতে এক নতুন স্লোগান তোলেন, ‘আসুন, ভারতে তৈরি করুন।’ বিশ্লেষকরা শ্রী মোদীর এই আগ্রাসী প্রচেষ্টা ইন্ডিয়া ইনকর্পোরেটেড এক-জানালামুখী ছাড়পত্র, ন্যূনতম প্রক্রিয়া ও লালফিতার দৌরাত্ম্যহীন ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ (ভারতে তৈরি করুন)-কে কর্মসংস্থান, প্রবৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ গতিসঞ্চার হিসেবে দেখছেন। এই বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের পর থেকে ভারত সরকার উৎপাদন, নকশা, উদ্ভাবন ও আরম্ভের ক্ষেত্রে গতিবেগ সঞ্চারের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে বিভিন্ন সংস্কারমূলক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। ভারত বিশ্বব্যাপী দ্রুততম প্রবৃদ্ধিশীল অর্থনীতি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ভারতের প্রবৃদ্ধির হার ৭.৫ শতাংশ ছাড়িয়ে যাচ্ছে এবং বিশ্বব্যাপী অবনত অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে প্রবৃদ্ধির মরুদ্যান হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’, ‘ডিজিটাল ইন্ডিয়া’, ‘একশো স্মার্ট শহর’ এবং ‘স্কিল ইন্ডিয়া’-র মত বিভিন্ন উদ্ভাবনী উদ্যোগ এই প্রবৃদ্ধিতে গতি সঞ্চার করেছে।

MAKE IN INDIA

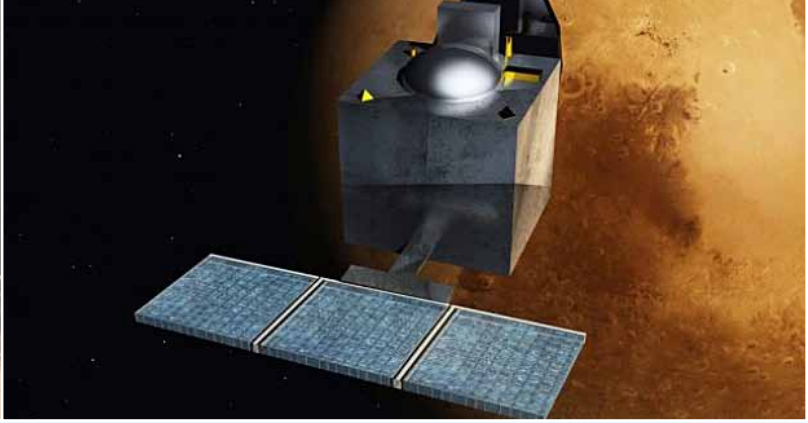

'মেক ইন ইন্ডিয়া' উদ্যোগের লক্ষ্য হচ্ছে ভারতকে বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করা। এটি ভারতীয় কোম্পানিসমূহের উৎকর্ষতাকে বৈশ্বিক কর্মজগতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা। ভারত বড় পরিসরে তার অর্থনীতি উন্মুক্ত করেছে। প্রতিরক্ষা, রেলওয়ে, নির্মাণ, বীমা, অবসর ফান্ড, চিকিৎসা সরঞ্জামের মত সবই এখন সরাসরি আন্তর্জাতিক বিনিয়োগের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। ভারত এখন বিশ্বের অন্যতম উদার অর্থনীতির দেশ।

এটি অর্জন করতে ভারত সরকার সহজে ব্যবসা করার ক্ষেত্র উন্নয়নের জন্য অনেকগুলি পদক্ষেপ নিয়েছে। এর লক্ষ্য হচ্ছে– ব্যবসায় সম্প্রসারণে সরল ও সহজ বিধিবদ্ধ পরিবেশ সৃষ্টি। ভারত বিভিন্ন দফতরের মধ্যে সমন্বয় ও যোগাযোগ রক্ষায় প্রযুক্তিকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করেছে। সরকারের বিভিন্ন সংস্থার কাছ থেকে ছাড়পত্র পেতে একমাত্র পোর্টাল হিসেবে ই-বিজ পোর্টালে ১৪টি সার্ভিস সমন্বিত করা হয়েছে।

'মেক ইন ইন্ডিয়া' ইতোমধ্যে উন্নত ব্যবসায়িক পরিবেশ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিরাট প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।

ভারত এখন বিশ্বের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিনিয়োগ গন্তব্য হিসেবে প্রথম; বিশ্বের দ্রুততম প্রবৃদ্ধিশীল অর্থনীতির মধ্যে প্রথম; প্রবৃদ্ধি, উদ্ভাবন ও নেতৃত্বের সূচকে একশো দেশের মধ্যে প্রথম; আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ১১৩টি বিনিয়োগ গন্তব্যের মধ্যে প্রথম; বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান জাতীয় ব্র্যান্ডের মধ্যে সপ্তম স্থান অধিকার করেছে। বিশ্ব ব্যাংকের তালিকায় ২০১৬-র সবচেয়ে সহজে ব্যবসা করার দেশের তালিকায় ভারত ১২ ধাপ এগিয়ে গেছে। ২০১৫-১৬ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা সূচকে ভারতের অবস্থান এখন ১৬।

'মেক ইন ইন্ডিয়া'-র সাফল্যের কাহিনি

রেলওয়ে মন্ত্রণালয় বিহারের মাধেপুরা ও মারহাউরায় লোকোমোটিভ তৈরির কারখানা প্রতিষ্ঠায় বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ কোম্পানি আলস্টোম বিএসই এবং জিই ট্রান্সপোর্টের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এছাড়া ইলেকট্রনিক্স, অটোমোবাইল, প্রতিরক্ষা, বিমান চলাচল প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিদেশী বিনিয়োগকারীরা উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া দিচ্ছেন।

'মেক ইন ইন্ডিয়া' শ্লোগানটি একটি কার্যকর কৌশলে পরিণত হয়েছে এবং আন্তর্জাতিকভাবে ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে। 'মেক ইন ইন্ডিয়া'র উদ্যোগে গতিবেগ সঞ্চারের জন্য ভারত সরকার ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মুম্বাইয়ে 'মেক ইন ইন্ডিয়া সপ্তাহ' নামে এক বিশেষ ইভেন্টের আয়োজন করে, যার উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী স্বয়ং।

দুই.

সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জন্য সুপরিচিত। ঐতিহাসিক সিন্ধু সভ্যতা এই অঞ্চলেই গড়ে উঠেছিল। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে এখানেই স্থাপিত হয়েছিল বিশালাকার একাধিক সাম্রাজ্য। নানা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বাণিজ্যপথ এই অঞ্চলের সঙ্গে বিশ্বের অন্যান্য সভ্যতার বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক রক্ষা করত। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ– বিশ্বের এই চার ধর্মের উৎসভূমি ভারত। খ্রিস্টীয় প্রথম সহস্রাব্দে জরথুষ্ট্রীয় (পারসি ধর্ম), ইহুদি, খ্রিস্ট ও ইসলাম ধর্ম এদেশে প্রবেশ করে ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ধীরে ধীরে ভারতীয় ভূখণ্ডের অধিকাংশ অঞ্চল নিজেদের শাসনাধীনে আনতে সক্ষম হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারত পুরোদস্তর একটি ব্রিটিশ উপনিবেশে পরিণত হয়। অতঃপর এক সুদীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে ১৯৪৭ সালে ভারত একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৫০ সালে সংবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে ভারত একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়।

ভারত ২৯টি রাজ্য ও সাতটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলবিশিষ্ট একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সাধারণতন্ত্র। ভারতে প্রত্যেক রাজ্যে নির্বাচিত রাজ্য সরকার অধিষ্ঠিত রয়েছে; নির্বাচিত সরকার রয়েছে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরি ও দিল্লিতেও। অপর পাঁচটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল রাষ্ট্রপতির প্রত্যক্ষ শাসনাধীন; এই অঞ্চলগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকার প্রশাসক নিয়োগ করে থাকেন।

ভারতীয় অর্থব্যবস্থা বাজারি বিনিময় হারের বিচারে বিশ্বে দ্বাদশ ও ক্রয়ক্ষমতা সমতার বিচারে বিশ্বে চতুর্থ বৃহত্তম। ১৯৯১ সালে ভারত সরকার গৃহীত আর্থিক সংস্কার নীতির ফলশ্রুতিতে আজ আর্থিক বৃদ্ধিহারের বিচারে ভারত বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলির মধ্যে দ্বিতীয়। তবে অতিমাত্রায় দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা ও অপুষ্টি এখনও ভারতের অন্যতম প্রধান সমস্যা। সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারত একটি বহুধর্মীয়, বহুভাষিক ও বহুজাতিক রাষ্ট্র। বিংশ শতকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও অন্যান্য রাজনৈতিক সংগঠনগুলি দেশজুড়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায়। মহাত্মা গান্ধী লক্ষাধিক মানুষকে সঙ্গে নিয়ে অহিংস গণ-আইন অমান্য জাতীয় আন্দোলন শুরু করেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষলগ্নে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ও তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগ্রাম ভারতের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত ব্রিটিশ শাসনজাল থেকে মুক্তিলাভ করে। একই সঙ্গে দেশের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের মুসলমান-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি বিভক্ত হয়ে গঠন করে পাকিস্তান রাষ্ট্র। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি নতুন সংবিধান প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে ভারতে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়।

স্বাধীনতার পরে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, জাতপাত, নকশালবাদ, সন্ত্রাসবাদ এবং জম্মু ও কাশ্মীর, পঞ্জাব ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ১৯৯০-এর দশক থেকে ভারতের শহরাঞ্চলগুলি এই হানাহানির শিকার হতে থাকে। চিন ও পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সীমান্ত নিয়ে তীব্র বিরোধ রয়েছে। ভারত রাষ্ট্রসংঘ (ব্রিটিশ ভারত হিসেবে) ও জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ১৯৭৪ সালে পোখরানের ভূগর্ভে পারমাণবিক পরীক্ষা ও ১৯৯৮ সালে আরও পাঁচটি পরমাণু পরীক্ষা চালিয়ে ভারত পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৯১ সালে শুরু হওয়া অর্থনৈতিক সংস্কারের ফলে বর্তমানে পৃথিবীর দ্রুত-বর্ধনশীল অর্থ ব্যবস্থা হিসেবে ভারত সারা বিশ্বে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে।

স্থল, বায়ু ও নৌসেনা নিয়ে গঠিত ভারতের সামরিক বাহিনি বিশ্বে তৃতীয় বৃহত্তম সামরিক শক্তি। এই সামরিক বাহিনির সমান্তরালে কাজ করে থাকে একাধিক সহকারী বাহিনি; আধাসামরিক বাহিনি, উপকূলরক্ষী বাহিনি ও স্ট্রাটেজিক ফোর্সেস কম্যান্ড এসবের অন্যতম। রাষ্ট্রপতি ভারতীয় সেনাবাহিনির সর্বাধিনায়ক। রাশিয়া, ফ্রান্স ও ইসরায়েল ভারতের প্রধান অস্ত্রসরবরাহকারী রাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা সহকারী দেশ। প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা ব্যালিস্টিক মিসাইল, যুদ্ধবিমান, যুদ্ধ-ট্যাঙ্কসহ দেশজ অত্যাধুনিক অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম উৎপাদনের কাজ তত্ত্বাবধান করে, যাতে সামরিক সরঞ্জামের ক্ষেত্রে ভারতকে অধিক মাত্রায় বিদেশি

আমদানির উপর নির্ভর করতে না হয়। ১৯৭৪ সালে স্মাইলিং বুদ্ধ ও ১৯৯৮ সালে পোখরান-২ নামে মোট ছয়টি প্রাথমিক পরমাণু পরীক্ষার মাধ্যমে ভারত পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ভারতের ঘোষিত পরমাণু নীতি হল 'প্রথম প্রয়োগ নয়'। ২০০৮ সালের ১০ অক্টোবর ভারত-মার্কিন বেসামরিক পরমাণু চুক্তি সাক্ষরিত হয়। তার আগেই আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা ও নিউক্লিয়ার সাপ্লায়ারস গ্রুপ ভারতের উপর থেকে পরমাণু প্রযুক্তি ক্রয়-বিক্রয়ের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। ফলে ভারত কার্যত পরিণত হয় বিশ্বের ষষ্ঠ পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্রে।

১৯৫০-এর দশক থেকে ১৯৮০-এর দশক পর্যন্ত ভারত সমাজতান্ত্রিক-ধাঁচের অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণ করে। ১৯৯১ সালে অর্থনৈতিক সংস্কারের মাধ্যমে ভারত ক্রমান্বয়ে তার বাজার উন্মুক্ত করে দেয়। বিদেশি বাণিজ্য ও বিনিয়োগের উপর সরকারি কর্তৃত্ব শিথিল করা হয়। এর ধনাত্মক প্রভাবে মার্চ ১৯৯১ সালের মার্চ মাসে ৫.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় ২০০৮ সালের ৪ জুলাই বেড়ে ৩০৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে এসে দাঁড়ায়। ভারতের মোট গড় আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপি ১.২৪৩ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ক্রয়ক্ষমতা সমতার (পিপিপি) পরিমাপে ৪.৭২৬ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমতূল্য। জিডিপির মানদণ্ডে ভারত বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি। চলতি মূল্যে ভারতের মাথাপিছু আয় ৯৭৭ মার্কিন ডলার (বিশ্বে ১২৮তম) যা ক্রয়ক্ষমতা সমতা (পিপিপি) ভিত্তিক পরিমাপে ২,৭০০ মার্কিন ডলারের সমতূল্য (বিশ্বে ১১৮তম)। বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে কৃষিপ্রধান দেশ হিসেবে পরিচিত ভারতের বর্তমান জিডিপিতে পরিষেবা খাতের অবদান ৫৪ শতাংশ; ইতোমধ্যে কৃষিখাতের অবদান হ্রাস পেয়ে ২৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে এবং শিল্পখাতের অবদান ১৮ শতাংশ। বিগত দুই দশকে বিশ্বের অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতি ভারতের গড় বার্ষিক জিডিপি বৃদ্ধির হার ছিল ৫.৭ শতাংশ।

৫১৬.৩ মিলিয়ন জনসংখ্যা অধ্যুষিত ভারত পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম শ্রমশক্তির দেশ। এই শক্তির ৬০ শতাংশ কৃষিখাতে ও কৃষি-সংক্রান্ত শিল্পগুলোতে নিয়োজিত, ২৮ শতাংশ পরিষেবা ও পরিষেবা-সংক্রান্ত শিল্পে এবং ১২ শতাংশ নিযুক্ত শিল্পখাতে। প্রধান কৃষিজ ফসলগুলি হল ধান, গম, তৈলবীজ, তুলা, পাট, চা, আখ ও আলু। প্রধান শিল্পগুলি হল অটোমোবাইল, সিমেন্ট, রাসায়নিক, বৈদ্যুতিন ভোগ্যপণ্য, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, যন্ত্রশিল্প, খনি, পেট্রোলিয়াম, ভেষজ, ইস্পাত, পরিবহণ উপকরণ ও বস্ত্রশিল্প। ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদগুলি হল আবাদি জমি, বক্সাইট, ক্রোমাইট, কয়লা, হিরে, আকরিক লৌহ, চুনাপাথর, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র, প্রাকৃতিক গ্যাস, পেট্রোলিয়াম ও আকরিক টাইটানিয়াম। ভারতের দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শক্তির চাহিদাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভারত পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের ষষ্ঠ বৃহত্তম ও কয়লার তৃতীয় বৃহত্তম ভোক্তা।

বিগত দুই দশকের উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও ভারত বিশ্বের সর্বাপেক্ষা দারিদ্র্যপীড়িত রাষ্ট্র। শিশু-অপুষ্টির হারও বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলির তুলনায় ভারতে সর্বাধিক। তবে বিশ্বব্যাঙ্ক নির্ধারিত দৈনিক ১.২৫ মার্কিন ডলারের আন্তর্জাতিক দারিদ্র্যরেখার নিচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা ১৯৮১ সালে ৬০ শতাংশ থেকে ২০০৫ সালে ৪২ শতাংশে নেমে এসেছে। সাম্প্রতিককালে, ভারতের বহুসংখ্যক শিক্ষিত ইংরেজিপটু প্রশিক্ষিত পেশাদাররা বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থা, মেডিক্যাল ট্যুরিজম ও আউটসোর্সিংয়ের কাজে নিযুক্ত। বর্তমানে ভারত সফটওয়্যার ও অর্থসংক্রান্ত, গবেষণাসংক্রান্ত ও প্রকৌশলগত পরিষেবার এক বৃহৎ রপ্তানিকারক। ২০০৭ সালে রপ্তানি ও আমদানির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৪৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ও ২১৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বস্ত্র, রত্ন, ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদি ও সফটওয়্যার ভারতের প্রধান রপ্তানি পণ্য। প্রধান প্রধান আমদানি পণ্যের মধ্যে রয়েছে অপরিশোধিত তেল, যন্ত্রপাতি, সার ও রাসায়নিক দ্রব্য। ভারতের প্রধানতম বাণিজ্য সহযোগী হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও চিন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে অতি প্রাচীন কাল থেকেই ভারত নিজস্বতার স্বাক্ষর রেখে এসেছে। খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকে ভারতীয় ধাতুবিদগণ দিল্লির লৌহস্তম্ভটি নির্মাণ করেন। বেদাঙ্গ জ্যোতিষ গ্রন্থে সে-যুগের মহাকাশ পর্যবেক্ষণের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিকতাবাদ প্রস্তাবনার ১০০০ বছর আগেই ভারতীয় গণিতবিদ তথা জ্যোতির্বিদ আর্যভট্ট প্রাচীন বিশ্বধারণার ভ্রান্ততা প্রমাণ করেছিলেন। প্রাচীন বিশ্বে একমাত্র ভারতেই গড়ে উঠেছিল হীরের খনি। শূন্য (০) ভারতীয়দেরই আবিষ্কার। ভারতীয় গণিতবিদ শ্রীনিবাস রামানুজন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতবিদদের অন্যতম বলে বিবেচিত। ১৯২৮ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন ভারতীয় পদার্থবিদ চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন।

স্বাধীনোত্তর ভারতকে একটি দরিদ্র রাষ্ট্র বলে বিবেচনা করা হলেও, স্বাধীনতা অর্জনের পাঁচ দশকের মধ্যেই এই দেশ প্রযুক্তিগতভাবে দক্ষিণ এশিয়ার এক মহাশক্তিধর রাষ্ট্রে পরিণত হয়। সাক্ষরতার হার ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং নগরকেন্দ্রের উদ্ভব ভারতের এই প্রযুক্তিগত উত্থানের কারণ। ১৯৭৫ সালে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ আর্যভট্টের উৎক্ষেপণ, তার পূর্ববর্তী বছরে স্মাইলিং বুদ্ধ নামে এক ভূগর্ভস্থ পারমাণবিক পরীক্ষা, দূরসংযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, পারমাণবিক চুল্লি ও হোমি জাহাঙ্গির ভাবা পরিচালিত বিএআরসি-র মত গবেষণাকেন্দ্রের বিকাশ ভারতের উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক সাফল্য। লো-আর্থ, মেরু ও জিওস্টেশনারি কক্ষপথে উপগ্রহ উৎক্ষেপণের এক দেশীয় প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে ভারত। এএসএলভি, পিএসএলভি, জিএসএলভি ও সর্বোপরি ইনস্যাট কৃত্রিম উপগ্রহ সিরিজগুলি ভারতের সফল মহাকাশ-কর্মসূচির স্বাক্ষর। ২০০৮ সালে চাঁদের মাটিতে অবতীর্ণ হয় প্রথম ভারতীয় মহাকাশযান চন্দ্রযান-১। দেশীয় বিমানশক্তির ক্ষেত্রে বিকল্প শক্তি হিসেবে অ্যাডভান্সড লাইট হেলিকপ্টার এবং এলসিএ তেজস-এর নাম করা যায়। ভারতের মহাকাশ বিদ্যা গবেষণা সংস্থা প্রথ মবারের মত ভারতে তৈরি স্পেস শাটল মহাকাশে স্থাপন করেছে। এটা মহাকাশ বিজ্ঞানে ভারতের একটা বড় সাফল্য। অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটা থেকে উৎক্ষেপণ করা হয় প্রথম ভারতে তৈরি স্পেস শাটল Reusable Launch Vehicle (RLV)। ৬.৫ মিটার লম্বা ও ১.৭৫ টন ওজনের এই স্পেস শাটল উৎক্ষেপণের পর সতীশ ধবন স্পেস সেন্টার থেকে ভারতের সফল উৎক্ষেপণের কথা ঘোষণা করা হয়।

Re-Usable Rocket-এর উন্নতির ক্ষেত্রে এবং মহাকাশে ভারতের স্যাটেলাইট পাঠানোর খরচ কমাতে এই স্পেস শাটল উৎক্ষেপণ দেশের মহাকাশ বিজ্ঞানীদের প্রাথমিক ধাপ। মূল শাটল আনতে আরো ১০ থেকে ১৫ বছর লাগবে বলে জানিয়েছেন ভরতের মহাকাশ বিজ্ঞানীরা। এই Reusable Launch Vehicle (RLV) প্রাথমিকভাবে তৈরিতে খরচ হয়েছে ৯৫ কোটি টাকা।

মঙ্গলের কক্ষপথে সফলতার সঙ্গে প্রবেশ করেছে ভারতের স্যাটেলাইট 'মঙ্গলায়ন'। এর মাধ্যমে মঙ্গলের কক্ষপথে প্রবেশের ক্ষেত্রে চতুর্থ স্থানে জায়গা করে নিল ভারত। ভারতের আগে সেখানে নভোযান পাঠিয়েছে রাশিয়া, নাসা এবং ইএসএ। তবে ভারতের এই অভিযানে

১৫ আগস্ট ১৯৪৭ ॥ লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জওহরলাল নেহরুর শপথবাক্য পাঠ করান

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, এই অভিযানে দেশটির খরচ হয়েছে মাত্র ৪.৫ বিলিয়ন রুপি বা ৭৪ মিলিয়ন ডলার। একই ধরনের অভিযানে নাসার তুলনায় ভারতের খরচ হয়েছে মাত্র ১১ ভাগ অর্থ।

এটি মঙ্গলে ভারতের প্রথম অভিযান। ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ISRO এই নভোযানটির উড্ডয়ন ঘটায়। ২০১৫-র নভেম্বরে এই নভোযানটি উৎক্ষেপণ করা হয়। সেই হিসেবে গত ১০ মাসে এটি অতিক্রম করেছে ৬৮০ মিলিয়ন কিলোমিটার বা ৪২২ মিলিয়ন মাইল। মাত্র কয়েকদিন আগেই মঙ্গলের কক্ষপথে প্রবেশ করেছিল নাসার নভোযান ম্যাভেন। উভয় নভোযানের ক্ষেত্রেই অবলম্বন করা হয়েছে Hohmann Transfer Orbit নামক একটি বিশেষ প্রযুক্তি। এটি হচ্ছে মঙ্গলে প্রবেশের একটি বিশেষ আবর্তন পথ। সাধারণত ২৬ মাস পরপর এটির দেখা পাওয়া যায়। আর এই আবর্তন পথ ব্যবহার করে সবচেয়ে কম জ্বালানি খরচে মঙ্গলে পৌঁছনো সম্ভব বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

প্রথমবারের প্রচেষ্টাতেই সফল হয়েছে দেশটির মহাকাশ গবেষণা সংস্থা। এই অভিযানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে অভিযানের মোট ব্যয়। নাসার মঙ্গল অভিযানের পেছনে খরচ হয়েছিল ৬৭২ মিলিয়ন ডলার। আর ভারতের খরচ হয়েছে মাত্র ৭৪ মিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ নাসার তুলনায় ৮৯ শতাংশ কম খরচেই অভিযানটি পরিচালনা করেছে ভারত।

২০০৩ সালে সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট অফ অ্যাডভান্সড কম্পিউটিং ভারতের প্রথম সুপারকম্পিউটার 'পরম পদ্ম' তৈরি করে। এটি পৃথিবীর দ্রুততম সুপারকম্পিউটারগুলির অন্যতম। ১৯৯০-এর দশকে অর্থনৈতিক উদারীকরণ এবং তথ্য প্রযুক্তি বিপ্লব ভারতকে তথ্য প্রযুক্তির দুনিয়ায় এক অগ্রণী রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের মঞ্চে উপস্থাপিত করে। বর্তমানে আইবিএম, মাইক্রোসফ্ট, সিসকো সিস্টেমস, ইনফোসিস, টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিস, উইপ্রো ও অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক কোম্পানি ভারতের বেঙ্গালুরু, হায়দ্রাবাদ, চেন্নাই প্রভৃতি শহরে তাদের প্রধান কার্যালয় স্থাপন করেছে।

ভারতের জাতীয় খেলা ফিল্ড হকি। ভারতীয় হকি দল ১৯৭৫ সালের পুরুষদের হকি বিশ্বকাপ ও একাধিক অলিম্পিক মেডেল বিজয়ী। অবশ্য ভারতে সর্বাধিক জনপ্রিয় খেলা হল ক্রিকেট। ভারতীয় জাতীয় ক্রিকেট দল ১৯৮৩ সালের ক্রিকেট বিশ্বকাপ, ২০০৭ সালের আইসিসি বিশ্ব টোয়েন্টি-২০ এবং ২০১১ সালের ক্রিকেট বিশ্বকাপ বিজয়ী। এছাড়াও ২০০৩ সালে ক্রিকেট বিশ্বকাপ ও ২০১৪ সালে আইসিসি বিশ্ব টোয়েন্টি-২০ তে ফাইনালে পরাজিত হয়। ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেট প্রতিযোগিতাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য রণজি ট্রফি, দলীপ ট্রফি, দেওধর ট্রফি, ইরানি ট্রফি ও চ্যালেঞ্জার সিরিজ। ভারতের জাতীয় দলের ক্রিকেটাররা প্রভূত জনপ্রিয় ও নানা বিশ্বরেকর্ডের অধিকারী।

ভারতীয় দলের ডেভিস কাপ বিজয়ের পর থেকে ভারতে টেনিসের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে ফুটবল পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর-পূর্ব ভারত, গোয়া ও কেরলে বেশ জনপ্রিয়। ভারত জাতীয় ফুটবল দল বহুবার সাউথ এশিয়ান ফুটবল ফেডারেশন কাপ জিতেছে। ভারত ১৯৫১ ও ১৯৮২ সালে এশিয়ান গেমস্-এর আয়োজন করেছিল। এছাড়াও ভারত ছিল ১৯৮৭ ও ১৯৯৬ এবং ২০১১ সালের ক্রিকেট বিশ্বকাপের সহ-আয়োজক দেশ। দাবা খেলার উদ্ভবও হয়েছিল ভারতে। গ্রান্ডমাস্টার দাবাড়ুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় আজ দাবা ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় একটি খেলা। ভারতের সর্বোচ্চ বেসামরিক ক্রীড়া পুরস্কার হল রাজীব গান্ধী খেলরত্ন ও অর্জুন পুরস্কার (খেলোয়াড়দের জন্য) এব দ্রোণাচার্য পুরস্কার (কোচিং-এর জন্য)।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা অর্জনের দিন কেউ হলফ করে বলতে পারেনি যে এই দেশ এতদিন অটুট থাকবে। পশ্চিমের রাজনীতিবিদেরা মনে করেছিলেন বহু ভাষা-ধর্মের দেশে অচিরেই ফাটল ধরবে। অর্থনীতিবিদেরা মনে করেছিলেন ব্রিটিশ পুঁজির প্রস্থান ও প্রযুক্তির অভাবে শিল্পায়ন হবে না। কিন্তু সব আশংকা পেছনে ফেলে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ও শক্তিশালী গণতন্ত্রের দেশ ভারত সত্তর বছরে পা রাখতে যাচ্ছে। এর জন্য সর্বাধিক কৃতিত্ব প্রাপ্য হল ভারতীয় সংবিধানের। পরমত সহিষ্ণুতা, ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ আর বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের অনুসন্ধানের মন্ত্র এই সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয় কৃতিত্ব অবশ্যই এর প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের, যাঁরা আধুনিক ভারত নির্মাণে উন্নত শিক্ষা পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য মৌলানা আবুল কালাম আজাদের মত একজন প্রাজ্ঞ রাজনীতিককে শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড, এর ফলিত উদাহরণ নিঃসন্দেহে আজকের ভারত।

● নিজস্ব প্রতিবেদন

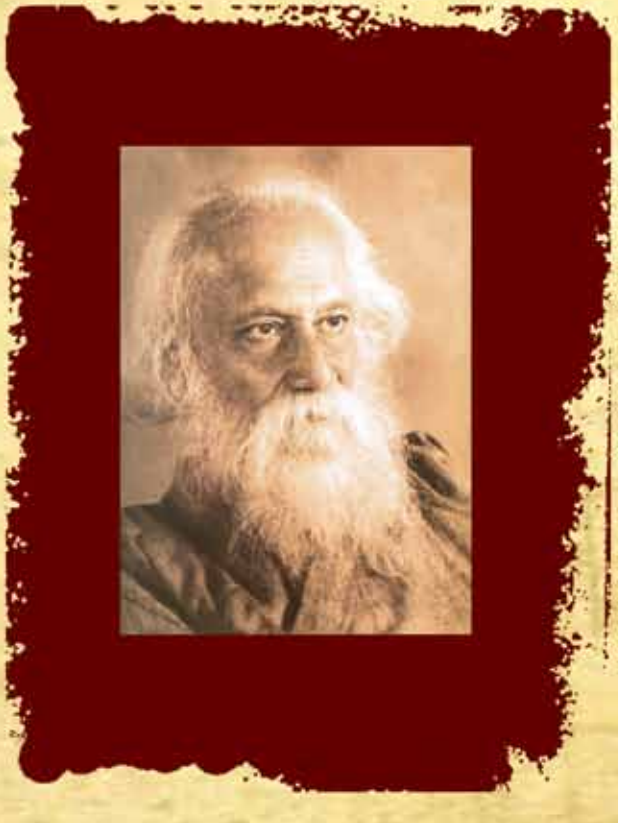

শ্রদ্ধাঞ্জলি

ফিরে ফিরে যাঁকে দেখতে হয় বারে বারে

জাহানারা নওশিন

কবিগুরু শান্তিনিকেতনে বসে ১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯ সালে লিখলেন একটি কবিতা, নাম– 'নিদ্রিতা'। আর পরের দিন ১৫ই জ্যৈষ্ঠ লিখলেন, 'সুপ্তোত্থিতা'। কবিতা দুটি *সোনারতরী* কাব্যগ্রন্থে স্থান পেয়েছে। তখন রাশি রাশি ফসলে রবীন্দ্রনাথের সোনারতরীখানি গভীর নদী পারাপার করছে। কবিতার ক্ষেত্রে তখন জোয়ার, কবিতায়, মানে রবিবাবু তখন সারস্বত জগতে বিশেষ স্থানের অধিকারী।

'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবেই তো লেখা হয়ে গেছে। '...প্রাণের বাসনা, প্রাণের আবেগ, রুধিয়া রাখিতে নারি।' বলাও হয়ে গেছে এবং সেই আবেগে 'আমি ঢালিব করুণাধারা, আমি ভাঙিব পাষাণ কারা, আমি জগৎ প্লাবিয়া, বেড়াবো গাহিয়া, আকুল পাগলপারা'। এই 'পাগলপারা' দিনেরও শেষ হয়েছে এবং *সোনারতরী*র পাকা ধানের সৌগন্ধে আপ্লুত কবি নিশ্চয়ই তখন আবেগের মোহন মাধুরী কাটিয়ে অনেকখানি স্থিতি লাভ করেছেন। তবু এমত সময়ে তিনি অতিশয় রোমান্টিক দুটি কবিতা লিখলেন– 'নিদ্রিতা' ও 'সুপ্তোত্থিতা'। তার আগে কিন্তু তিনি জোড়াসাঁকোয় বসে ১২৯৮ সালের চৈত্রমাসে 'রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে' নামে আরেকটি কবিতা লেখেন। কবিতাটির শিরোনামের নীচে লেখা আছে– 'রূপকথা'। কবিতাটির মোদ্দা কথা হল রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে রোজ পাঠশালায় যায় (না, তারা ভাইবোন নয়)। কবিতাটির আরম্ভ এভাবে–

'রাজার ছেলে যেত পাঠশালায়,
রাজার মেয়ে যেত তথা।

চিত্রার 'সিন্ধুপারে' কবিতাটিও আমাদের মনে পড়ছে এবং প্রথমোক্ত তিনটি কবিতার সঙ্গে এর সম্পৃক্ততা অনিবার্য হয়ে উঠছে এবং তখন আমাদের মনে হচ্ছে এ মোটেই নিছক রূপকথা নয়। কবিতাটির পরম্পরায় বা ধারাবাহিকতায় এমন স্বপ্নের রূপায়ণ আছে যার মধ্যে কবির অন্তর্জগতে উপলব্ধির রসায়ন-ক্রিয়ায় নতুন এক সত্তার উন্মেষ ঘটছে...

দুজনে দেখা হতো পথের মাঝে
কে জানে কবেকার কথা।
... ...
'রাজার মেয়ে দূরে সরে যেত
চুলের ফুল তার পড়ে যেত
রাজার ছেলে এসে তুলে দিত
ফুলের সাথে বনলতা।'

এইভাবে প্রভাতে, মধ্যাহ্নে ও সাহাহ্নে নিশীথের– এই চার প্রহরের বর্ণনায় কবিতাটিতে দুটি ছেলেমেয়ের মিষ্টি মিষ্টি ভাল লাগার কথা বলা আছে। যেমন–

'উপরে বসে পড়ে রাজার মেয়ে
রাজার ছেলে বসে নীচে
দুপুরের খরতাপ, বকুল শাখে
কোকিল কুহু কুহরিছে
রাজার ছেলে চায় উপর পানে
রাজার মেয়ে চায় নীচে।'

এইভাবে কবিতাটি চলতে থাকে– রাজার মেয়ে সোনার খাটে শুয়ে স্বপ্ন দেখে রাজার ছেলের। রাজার ছেলেও রাজকন্যার স্বপ্ন দেখে রূপোর খাটে শুয়ে।

এখন জিজ্ঞাস্য হতে পারে কবিতাগুলির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা না করে কেন এত বিস্তৃত উদ্ধৃতি দিচ্ছি? এর উত্তর দিতে গিয়ে আমাদের কাছে আরো একটি প্রশ্ন উঁজিয়ে আসে– রবীন্দ্রনাথ তখন তো বেশ পরিণত তাহলে কেন এই রকম রূপকথার গল্পের মত কবিতা লিখলেন? এখন ব্যাখ্যা করলেই দেখা যাবে এ শুধুই রূপকথার ঠাকুরমার ঝুলির ব্যাপার নয়। এখন কবিতাগুলিকে পর পর বিবেচনার মধ্যে রেখে উত্তর খোঁজা যেতে পারে। খুঁজতে গিয়ে আমরা দেখব *চিত্রার* 'সিন্ধুপারে' কবিতাটিও আমাদের মনে পড়ছে এবং প্রথমোক্ত তিনটি কবিতার সঙ্গে এর সম্পৃক্ততা অনিবার্য হয়ে উঠছে এবং তখন আমাদের মনে হচ্ছে এ মোটেই নিছক রূপকথা নয়। কবিতাগুলির পরম্পরায় বা ধারাবাহিকতায় এমন স্বপ্নের রূপায়ণ আছে যার মধ্যে কবির অন্তর্জগতে উপলব্ধির রসায়ন-ক্রিয়ায় নতুন এক সত্তার উন্মেষ ঘটছে এবং সেখানে সেই অজানা সত্তার অনিবার্য আগমন-ধ্বনি রুনুঝুনু নূপুরের মত নিত্য বেজে উঠছে যা তাঁকে তাঁরই সত্তার বা অমিত্বের দ্বিতীয় এক 'আমি'র মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে এবং 'আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে' দাঁড়িয়ে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটছে নিজেরই ভিতরের আরেক 'আমি'র সঙ্গে। এই মন্তব্যটি পুরোপুরি বিশ্লেষণের জন্যে আমরা একবার দেখে নিতে পারি কি ঘটছে 'সিন্ধুপারে' কবিতায়।

গভীর সুপ্তমগ্ন বিছানায় কারুর আহ্বানে কবির সেই জেগে ওঠা–

'অকাতর দেহে আছিনু মগন সুখ নিদ্রার ঘোরে,
তপ্ত শয্যা প্রিয়ার মতন সোহাগে ঘিরেছে মোরে।' (সিন্ধুপারে)

এমন সময় শুনতে পেলেন কেউ তাঁর নাম ধরে ডাকছে। ঘুম গেল ছুটে, চকিত চমকে জেগে উঠলেন তিনি। দুয়োর খুলে বাইরে এসে দেখলেন–

'দেখিনু দুয়ারে রমণী মুরতি অবগুণ্ঠনে ঢাকা
কৃষ্ণ অশ্বে বসিয়া রয়েছে, চিত্রে যেন সে আঁকা।

আরেক অশ্ব দাঁড়ায়ে রয়েছে, পুষ্প ভূতল চুমে,
ধূম্রবরণ, যেন দেহ তার গঠিত শ্মশান ধূমে।

নড়িল না কিছু, আমারে কেবল হেরিল আঁখির পাশে,
শিহরি শিহরি সর্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল ত্রাসে।' (সিন্ধুপারে)

অশ্বের এই ধূম্রবরণ আমাদের কিছু একটার আভাস দেয় কি? যা পরিপূর্ণ দৃষ্টিগোচর হয় না, যা বোঝা না বোঝার আবরণে স্বরূপকে লুকিয়ে রাখে– যার কিছু বা দেখি কিছু বা দেখি না বা দেখতে পাই না, যেটুকু বা দেখি তা বুঝে উঠতে পারি না বা বুঝে উঠতে না উঠতে মিলিয়ে যায় অথচ একটা কিছুর ইঙ্গিত দিয়ে একটা কিছুর আবছা ছবি ফুটিয়ে অন্তরালে হারিয়ে যায়! তখন কি ধূম্রবরণের আড়ালে ভবিষ্যতের কুয়াশা মাখা একটা কিছুর ধারণায় আমাদের মন রহস্যময় একটা কিছুর জন্যে তৈরি হয়ে যায়? তা যদি হয় তাহলে ঘোড়ার ধূম্রবরণটিকে নেহাৎই একটা বর্ণনার অংশ বলে মনে হয় না। তারপর তো কবিতার মধ্যেই তা ক্রমশ বিভাসিত হয়ে ওঠে–

নীরব রমণী অঙ্গুলি তুলি দিল ইঙ্গিত করি
মন্ত্রমুগ্ধ অচেতন-সম চড়িনু অশ্ব পরি।'

অশ্ব ছুটে চলে। পিছুপানে তাকিয়ে কি দেখলেন কবি?

'ঘরদ্বার ঘোর বাষ্প সমান মনে হলো সব মিছে।' (সিন্ধুপারে)

'লক্ষ্য বিহীন তীরের মতন' ঘোড়া ছুটছে, পায়ের শব্দ নেই যেন সে মাটি স্পর্শ করে ছুটছে না, মাঝে মাঝে চেনাজগৎ মনে হয় কিন্তু নিমেষ ফেলতেই কোথায় চলে যায় কিছুই বোঝা যায় না। এইসব জানার পরেই কিন্তু আমাদের মন রহস্যময় কিছুর জন্যে তৈরি হয়ে যায়।

চাঁদ যখন ঢলে পড়েছে অথচ পুবের আকাশে তখনো ঊষার প্রবেশ হয়নি তখন অশ্বটি থামল।

'জনহীন এক সিন্ধু পুলিনে অশ্ব থামিল আসি,
সমুখে দাঁড়ায়ে কৃষ্ণ শৈল গুহামুখ পরকাশি।' (সিন্ধুপারে)

কিন্তু সেখানে সাগরের শব্দ নেই, পাখির গান নেই, এমনকি বনের গন্ধ মেখে প্রভাত বায়ুও বয় না। কেউ কোথাও নেই যেন জনশূন্য একটি জায়গা। সেইখানে,

অশ্ব হইতে নামিল রমণী, আমিও নামিনু নীচে,
আঁধার-ব্যাদান গুহার মাঝারে চলিনু তাহার পিছে।' (সিন্ধুপারে)

তারপর কি দেখলেন তিনি? বিশাল প্রাসাদ, ভিতরে পাথরের স্তম্ভের সারি, কনক শিকলে ঝুলন্ত বাতিদানে প্রদীপ জ্বলছে সারিসারি, চারিপাশে লতাপাতা ফুল পাখির চিত্র, তার মাঝখানে মুক্তার ঝালর গাঁথা চাঁদোয়া খাটানো। চাঁদোয়ার নীচে, ...'মণি পালঙ্ক-পরে অমল শয়ন পাতা।' কিন্তু সেখানে আর কেউ নেই– দাসদাসী, প্রহরী কেউ নেই। তখন,

'নীরবে রমণী আবৃত বদনে বসিলা শয়ন 'পরে,
অঙ্গুলি তুলি ইঙ্গিত করি পাশে বসাইল মোরে।' (সিন্ধুপারে)

সহসা দশদিক থেকে বীণা-বেণু বেজে উঠল, মাথার ওপরে ঝরে পড়ল অজস্র পুষ্পরেণু, প্রদীপমালা জ্বলে উঠল দ্বিগুণ তেজে। অবগুণ্ঠনের ভিতর থেকে রমণীর হাস্যধ্বনি শোনা গেল। কবি ভয় পেলেন, হিম হয়ে গেল সারা শরীর, বললেন–

'আমি যে বিদেশী অতিথি, আমায় ব্যথিয়োনা পরিহাসে
কে তুমি নিদয় নীরব ললনা কোথায় আনিলে দাসে।
অমনি রমণী কনকদণ্ড আঘাত করিল ভুমে,
আঁধার হইয়া গেল সে ভবন, রাশি রাশি ধূপধূমে।
বাজিয়া উঠিল শতেক শঙ্খ হুলু কলরব সাথে,
প্রবেশ করিল বৃদ্ধ বিপ্র ধান্যদুর্বা হাতে।' (সিন্ধুপারে)

তখন পিছনে দাসদাসী– কেউ মালা, কেউ চামর, কেউ তীর্থজল হাতে

বাস্তব জীবনের ছবির যেসব ছাপ স্মৃতির ভাণ্ডারে জমা হয় তা ভাবনার ভিতর দিয়ে নিরন্তর আনাগোনায় কখন কি রূপে তাদের আবার দেখতে পাব তা আমরা নিজেরাও জানি না। এর ওপর কারুর কর্তৃত্ব চলে না। অর্থাৎ নিজের চিন্তার বা স্মৃতির ওপর নিজেরই কোন কর্তৃত্ব বা নিয়ন্ত্রণ নেই। কে যে তা নিয়ন্ত্রণ করছে তাও জানি না।

দাঁড়িয়ে রইল। বৃদ্ধ বিপ্র খড়ি কষে বললে, 'এখন হয়েছে লগ্ন কাল।'

শয়ন ছাড়িয়া উঠিল রমণী বদন করিয়া নত
আমিও উঠিয়া দাঁড়াইনু পাশে যন্ত্রচালিতের মত।
নারীগণ সবে ঘেরিয়া দাঁড়াল একটি কথা না বলি
দোঁহাকার মাঝে ফুলদল-সাথে বরষি জলাঞ্জলি।
পুরোহিত শুধু মন্ত্র পড়িল আশিস করিয়া দোঁহে,
কী ভাষা, কী কথা কিছু না বুঝিনু দাঁড়ায়ে রহিনু মোহে।
অজানিত বধূ নীরবে সঁপিল শিহরিয়া কলেবর,
হিমের মত মোর করে, তার তপ্ত কোমল কর।' (সিন্ধুপারে)

এরপর বিপ্র এবং দাসীগণ চলে যায়। কেবলমাত্র একজন যায় না। সে প্রদীপের আলোয় পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল তাদের দুজনকে। অন্ধকার দীর্ঘপথ সভয়ে পার হয়ে নানান বরণের আলোয় আলোকিত ও নানান বরণের ফুল ও রত্ন সজ্জিত একটি ঘরে প্রবেশ করলেন এবং দেখলেন, 'মণি বেদিকায় কুসুম শয়ন–' যেন একখানি স্বপ্ন রচনা। তার পাদপীঠে... 'চরণ প্রসারি শয়নে বসিল বধূ।' বিস্মিত অভিভূত কবি নীরবতা না ভেঙে আর থাকতে পারেন না।

'আমি কহিলাম, সব দেখিলাম তোমারে দেখিনি শুধু।'

তখন চারিপাশ থেকে শত কৌতুক-হাসি উচ্ছ্বসিত হল এবং 'শত ফোয়ারায় উছসিল যেন পরিহাস রাশি রাশি।' তারপর হল সেই বহু প্রতীক্ষিত রহস্য উন্মোচন।

'সুধীরে রমণী দুবাহু তুলিয়া অবগুণ্ঠনখানি,
উচায়ে ধরিয়া মধুর হাসিল মুখে না কহিয়া বাণী।
চকিত নয়নে হেরি মুখপানে পড়িনু চরণ তলে,
'এখানেও তুমি জীবনদেবতা!' কহিনু নয়ন জলে।' (সিন্ধুপারে)

এখন একেবারে সামনাসামনি মুখোমুখি অন্তর বাহিরের দেখা হল। কিন্তু আগেই তো দেখা হয়েছে, না হলে কেন বলবেন, 'এখানেও তুমি জীবনদেবতা!' কখন দেখা হয়েছিল তবে? হয়তো সে দেখা সচেতন নয়, বাল্যকাল থেকেই নানান ফাঁকে-ফোঁকড়ে উঁকিঝুঁকি দিয়ে গেছে সে। বাল্যকাল থেকেই কি তিনি আপনমনে অজানা কিছুর আভাস পেতেন না বা কিছু খুঁজতেন না যা বোধের জগতে তাঁকে উতলা করত? কিন্তু সেই খোঁজা কখনই কোন কারণে সরাসরি বা স্পষ্ট করে খোঁজা নয়। নিজের ভিতরেই কিছু খোঁজা– এ যেন আপন অন্তরের রহস্যকেই বাইরে এনে দেখবার প্রয়াস। বাল্যকাল থেকেই তো এই বালক প্রকৃতি জগতের, এমনকি বস্তু জগতেরও অনেক কিছুর ভিতরেই এক অজানা রহস্যের আন্দাজ পেতেন এবং সেই মোহে বালকটি 'খড়ির সেই গণ্ডীর' ভিতরেও আবিষ্ট হয়ে থাকতেন– তা আমাদের মনে পড়ে। বাল্যকালে এই মাটির পৃথিবীকে দেখার সেই বিবরণ তাঁর ভাষাতেই একবার দেখি। *জীবনস্মৃতি* থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি আশাকরি ভাল লাগবে, 'ছেলেবেলাকার দিকে যখন তাকানো যায় তখন সবচেয়ে এই কথাটা মনে পড়ে যে, তখন জগৎটা এবং জীবনটা ছিলো রহস্যে পরিপূর্ণ। সর্বত্রই যে একটি অভাবনীয় আছে এবং কখন যে তাহার দেখা পাওয়া যাইবে তাহার ঠিকানা নাই, এই কথাটা প্রতিদিন মনে জাগিত। প্রকৃতি যেন হাত মুঠা করিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিত, 'কী আছে বলো দেখি।' কোনটা থাকা যে অসম্ভব, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিতাম না।... তখনকার দিনে এই পৃথিবী বস্তুটার রস কী নিবিড় ছিলো, সেই কথাই মনে পড়ে। কী মাটি, কী জল, কী গাছপালা, কী আকাশ, সমস্তই তখন কথা কহিত– মনকে কোন মতেই উদাসীন থাকিতে দেয় নাই। পৃথিবীকে কেবলমাত্র উপরের তলাতেই দেখিতেছি। তাহার ভিতরের তলাটা দেখিতে পারিতেছি না, ইহাতে কতদিন যে মনকে ধাক্কা দিয়াছে তাহা বলিতে পারি না। কী করিলে, পৃথিবীর এই উপরকার এই মেটে রঙের মলাটটাকে খুলিয়া ফেলা যাইতে পারে, তাহার কতই প্ল্যান ঠাওরাইয়াছি।' এসব লেখা থেকেই বোঝা যায় এই বালকটির আর পাঁচটা বালকের মত হাডুডু, মার্বেল, লাটিম বা ফুটবল খেলে সময় যায়নি। এ একটি ভীষণ স্বপ্নদর্শী বালক যে বস্তুজগতের অন্তরালে আরেকটি রহস্যময় জগতের ছায়া দেখতে পেত যা তেমন স্পষ্ট নয় অথচ মাঝে মাঝে স্বপ্নের ভিতরে বা কল্পনার ভিতরে তা বিন্দু বিন্দু আলোয় অবয়ব পেতে চাইছে– কখনো ইঙ্গিতে কখনো গভীর উপলব্ধির মধ্যে।

এই সঙ্গে আমরা তাঁর *জীবনস্মৃতি* লেখবার ভূমিকা হিসেবে যা বলেছিলেন সেখান থেকেও একটু ঘুরে আসতে পারি। কারণ আর কিছুই নয় শুধু জানতে পারা যাবে যে মানুষটি আপন ভিতরের জগতকে কত রকমভাবে দেখতে পেয়েছেন এবং সেই বোধ আমাদের মধ্যেও প্রবিষ্ট করাতে পেরেছেন। তিনি লিখছেন, 'স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না। কিন্তু যেই আঁকুক সে ছবি আঁকে। অর্থাৎ যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহার অবিকল নকল রাখিবার জন্য সে তুলি হাতে বসিয়া নাই। সে আপনার অভিরুচি-অনুসারে কত কী বাদ দেয়, কত কী রাখে। কত বড়কে ছোট করে, ছোটকে বড় করিয়া তোলে। সে আগের জিনিসকে পাছে ও পাছের জিনিসকে আগে সাজাইতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না। ...এইরূপে জীবনের বাহিরের দিকে ঘটনার ধারা চলিয়াছে আর ভিতরের দিকে সঙ্গে সঙ্গে ছবি আঁকা চলিতেছে। দু'য়ের মধ্যে যোগ আছে অথচ দুই ঠিক এক নহে। আমাদের ভিতরের এই চিত্রপটের দিকে তাকাইবার অবসর থাকে না। ক্ষণে ক্ষণে ইহার অধিকাংশই অন্ধকারে অগোচরে পড়িয়া থাকে।' (*জীবনস্মৃতির* ভূমিকা)

অগোচরে অন্ধকারে পড়ে থাকা এই ছবিগুলো কখন যে কার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে বা অপরিমেয় ছবির বিচিত্র মিশ্রণে কে যে কি আকৃতি পেয়ে আমাদের চিন্তার ওপর-তলে উঠে এসে কি ছবি দেখাবে তা কেউ জানে না। দেখা যাবে জগতের নানান ঘটনাই চেতনার বিভিন্ন স্তরে যেসব ছবি তৈরি করে তা ঘটনার হুবহু ছবি হয়ে বাস্তবে আসে না আমাদের কাছে। নানান চিন্তা ও অনুভবের রসায়নে তা দ্রবীভূত হয়ে যা ঘটে নাই তাও আমাদেরকে দেখায় বা ইঙ্গিত দেয়। এইজন্যেই বোধহয় তিনি বলেছেন, 'জীবনের স্মৃতি জীবনের ইতিহাস নহে– তাহা কোন এক অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্তের রচনা। তাহাতে নানা জায়গায় নানা রঙ পড়িয়াছে তাহা বাহিরের প্রতিবিম্ব নহে– সে রঙ তাহার নিজের ভাণ্ডারের, সে রঙ তাহাকে নিজের রসে গুণিয়া লইতে হইয়াছে; সুতরাং পটের উপর যে ছাপ পড়িয়াছে তাহা আদালতে সাক্ষ্য দিবার কাজে লাগিবে না।' কবির এই কথায় এইটাই বোঝা যায় যে বাস্তব জীবনের ছবির যেসব ছাপ স্মৃতির ভাণ্ডারে জমা হয় তা ভাবনার ভিতর দিয়ে নিরন্তর আনাগোনায় কখন কি রূপে তাদের আবার দেখতে পাব তা আমরা নিজেরাও জানি না। এর ওপর কারুর কর্তৃত্ব চলে না। অর্থাৎ নিজের চিন্তার বা স্মৃতির ওপর নিজেরই কোন কর্তৃত্ব বা নিয়ন্ত্রণ নেই। কে যে তা নিয়ন্ত্রণ করছে তাও জানি না। কে যে সেই আজানা 'অপারেটর' এই কাজের কাজী তাই বা কে বলবে?

বালক বয়সের সেই যে রবীন্দ্রনাথের খেলার সঙ্গিনী– *জীবনস্মৃতিতে* যার দেখা পাই যে বালিকা কবিকে একটি রাজবাড়ির কথা বলেছিল এবং নির্দেশ করেছিল যে রাজবাড়িটি কবির বাড়িতেই কোথাও আছে– সেই তখনকার কথাগুলো একটু স্মরণ করি। "কখনো কখনো তাহার কাছে শুনিতাম, 'আজ সেখানে গিয়াছিলাম।' কিন্তু একদিনও এমন সুযোগ হয়

ঠিকানা তো লেখাই ছিল সুতরাং আমরা অনুমান করতেই পারি কবিকে খুঁজে পেতেও তার বেগ পেতে হয়নি। সুতরাং মিলনের নিখুঁত আয়োজনে নিজেকে উন্মোচন করে দেখিয়ে দেয়া যে– এই দেখ তোমার স্বপ্নের আমি 'আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে' দাঁড়িয়াছি।

নাই যখন আমিও তাহার সঙ্গ ধরিতে পারি। সে একটা আশ্চর্য জায়গা, সেখানে খেলাও যেমন আশ্চর্য খেলার সামগ্রীও তেমনি অপরূপ। মনে হইত, সেটা অত্যন্ত কাছে এক তলায় বা দোতলায় কোন একটা জায়গায়; কিন্তু কোনমতেই সেখানে যাওয়া ঘটিয়া ওঠে না। কতবার বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, 'রাজার বাড়ি কি আমাদের বাড়ির বাহিরে?' সে বলিয়াছে, 'না এই বাড়ির মধ্যেই।' আমি বিস্মিত হইয়া বসিয়া ভাবিতাম, বাড়ির সকল ঘরই তো আমি দেখিয়াছি কিন্তু সে ঘর তবে কোথায়? রাজা যে কে সে কথা কোনদিন জিজ্ঞাসা করি নাই, রাজত্ব যে কোথায় তাহা আজ পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত রহিয়া গিয়াছে। কেবল একটিমাত্রআভাস পাওয়া গিয়াছে যে আমাদের বাড়িতেই সেই রাজবাড়ি।" দেখা যায় বালক বয়স থেকেই একটি রহস্যময় জগতের মোহপাশ তাঁকে জড়িয়ে থাকে। অদেখা এই বাড়িটিই কি 'সিন্ধুপারে' কবিতায় রাজবাড়ি হয়ে স্বপ্নে আসে? কে জানে মানুষের অতল অন্তর্জগতের অন্ধকার ফুঁড়ে কোন অভিলাষের স্মৃতি কোথায় কেমন করে অনুভবক্ষেত্রের আলোয় ফুটে ওঠে! কোথাকার জিনিস কোথায়, কিভাবে, কতদিন পরে কিসের অনুসরণে স্মৃতির জগতে– স্মৃতির স্রোতের মধ্যে জেগে ওঠে তার হিসেব কেউ জানে না।

এখন এই প্রসঙ্গে *সোনারতরী*ভুক্ত যে কবিতা তিনটির কথা আগেই উল্লেখ করেছি সেগুলো একটু খতিয়ে দেখা যেতে পারে। 'রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে' কবিতায় যে মুগ্ধ বালকের কথা জানলাম যে বালক স্কুলের পথে রাজার মেয়ের মাথার ফুল পড়ে গেলে কুড়িয়ে দিত এবং সঙ্গে বনলতাও বাড়িয়ে দিত, তাকিয়ে থাকত মেয়ের মুখের দিকে, রূপোর পালঙ্কে শুয়ে মেয়েটির হাসি দেখত যে কল্পনায়, সেই বালক যে সাধারণ বালক নয় সে যে এক স্বপ্ন-ডোবা সত্তাকে বয়ে বেড়ায় তা তো বোঝাই যায়। এই বালকই একদিন যৌবনপ্রাপ্ত হয় এবং এক নিশীথে,

....
'একদা রাতে নবীন যৌবনে
স্বপ্ন হতে উঠিনু চমকিয়া
বাহিরে এসে দাঁড়ানু একবার
ধরার পানে চাহিনু নিরখিয়া।
...
অশ্ব চড়ি তখনি বাহিরিনু
কত যে দেশ বিদেশ হনু পার।
একদা এক ধূসর সন্ধ্যায়
ঘুমের দেশে লভিনু পুরদ্বার।' (নিদ্রিতা)

দেখা যাচ্ছে সেখানে সবাই ঘুমে অচেতন। হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, রাজঅন্তঃপুরে রাজারানী রাজপুত্র সেপাই সান্ত্রী সবাই ঘুমে অচেতন। এই ঘুমে অচেতন দেশ আমাদের কাছে গভীর এক দ্যোতনা বা তাৎপর্য বহন করে যাতে করে আমাদের মনে হয় এই অচেতন দেশটি কবিরই অন্তর্জগতের গহন গভীরে সুপ্ত এক মনোহর যেখানে নিদ্রিত আছে তাঁর জীবনদেবতারই সুপ্ত রূপ যাকে তিনি একদিন মালা পরিয়ে এসেছিলেন, যার মোহন রূপে এবং যাকে দেখে যৌবনের উত্তাপ এক sublime সৌন্দর্যবোধে পৌঁছেছেন এবং স্বর্গীয় গরিমায় বিভূষিত হয়েছেন। এই কবিতাটির অপরূপ একটি স্তবকের উদ্ধৃতি দিলে উপর্যুক্ত মন্তব্যের মর্যাদা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে,

'কমল ফুল বিমল সেজখানি,
বিলীন তাহে কোমল তনুলতা।
মুখের পানে চাহিনু অনিমেষে,
বাজিল বুকে সুখের মত ব্যথা।
মেঘের মত গুচ্ছ কেশরাশি
শিথান ঢাকি পড়েছে ভারে ভারে;
একটি বাহু বক্ষ-পরে পড়ি
একটি বাহু লুটায় একধারে।
আঁচলখানি পড়েছে খসি পাশে,
কাঁচলখানি পড়িবে বুঝি টুটি;
পত্রপুটে রয়েছে যেন ঢাকা
অনাঘ্রাত পূজার ফুলদুটি।' (নিদ্রিতা)

কোন যুবতী কন্যার স্তনকে নবীন যৌবনে কোন পুরুষ অনাঘ্রাত পূজার ফুলের সঙ্গে তুলনা করতে পেরেছেন বা ভাবতে পেরেছেন বলে আমাদের জানা নেই। কবির যৌনবোধে কী অপরূপ সুষমা! কিন্তু এ আলোচনা এখানে নয় বরং অবতারণিকায় ফিরে যাই। উপর্যুক্ত কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যে কন্যার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ করালেন তাকেই কি তিনি পরিণত রমণীর রূপ দিয়ে সিন্ধুপারের রাজপুরীতে আমাদের দেখালেন? কথা উঠতে পারে সিন্ধুপারের রমণীতো রহস্যময়ী অবগুণ্ঠিতা যাকে কবিও গুণ্ঠন মোচনের আগে চিনতে পারেন নাই। চিনতে পারার কথাওতো নয় কারণ ঘুমন্তপুরীতে নিদ্রিত কন্যার শায়িত তনুলতা একদিন যদি আপাদমস্তক আবরণে আবির্ভূত হয় তবে স্পষ্ট আলোয় উন্মোচিত না হলে চেনা যাবে কি করে? কিন্তু গুণ্ঠন উন্মোচন হলেই তিনি চমকে ওঠেন এবং যা বলে ওঠেন তাতেই আমাদের মনে হয় তাহলে কবি পূর্বেই কোথাও তাকে দেখেছিলেন। ঘোমটা উন্মোচনের পর কি বলেছিলেন তিনি তা তো আমাদের মনে আছে– 'এখানেও তুমি জীবনদেবতা?'

আমাদের মনে আছে 'নিদ্রিতা'য় এক কন্যাকে তিনি দেখেছিলেন, যার মুদ্রিত চোখের পাতায় তিনি চুম্বনও করেছিলেন, মালা পরিয়ে এসেছিলেন এবং ভূর্জপাতে কাজল কালি দিয়ে নিজের নামধাম লিখেও দিয়ে এসেছিলেন–

'ভূর্জপাতে কাজল মসী দিয়া
লিখিয়া দিনু আপন নামধাম।
লিখিনু, 'অয়ি নিদ্রানিমগনা
আমার প্রাণ তোমারে সঁপিলাম।'
যতন করি কনক সূত্রে গাঁথি
রতনহারে বাঁধিয়া দিনু পাঁতি।
ঘুমের দেশে ঘুমায় রাজবালা
তাহারি গলে পরায়ে দিনু মালা।'

আমরা যদি এখন এমত মনে করি যে এই কন্যাই রমণীয় নারীতে পরিণতি প্রাপ্তির পর অবগুণ্ঠনের আড়ালে ধূম্রবরণ অশ্বে কবিকে উঠিয়ে এনে মিলন মেলার চমৎকার ব্যবস্থা করেছিল তাহলে খুব অসঙ্গতি দেখা দেয় কি? ঠিকানা তো লেখাই ছিল সুতরাং আমরা অনুমান করতেই পারি কবিকে খুঁজে পেতেও তার বেগ পেতে হয়নি। সুতরাং মিলনের নিখুঁত আয়োজনে নিজেকে উন্মোচন করে দেখিয়ে দেয়া যে– এই দেখ তোমার স্বপ্নের আমি 'আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে' দাঁড়িয়াছি।

এতক্ষণ এইযে আমরা রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা নিয়ে এতখানি জল্পনা-কল্পনা করলাম তার সুত্রপাতটি কোথায়? একটু খোঁজ করলেই দেখা যাবে মোরান সাহেবের বাগানের সেই গঙ্গাতীরের বাড়িটির সর্বোচ্চতম গোল ঘরটিতে বসে তিনি একটি কবিতা লিখেছিলেন–

'অনন্ত এ আকাশের কোলে

তাঁর ছবির জগতে ঢুকলে প্রায়ই ছবিতে দেখা যায় ছবির গভীর তল থেকে, কখনো কখনো কালো অন্ধকার তল থেকে বিন্দু বিন্দু আলোর ফুটকির আভা বা ছেঁড়া ছেঁড়া আলোর আভা জেগে উঠছে। আমাদের জীবনের যে অনন্ত অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যৎ তা অন্ধকারে ঢাকা।

টলমল মেঘের মাঝার
এইখানে বাঁধিলাম ঘর
তোর তরে কবিতা আমার।'

কবিতার তরে এই ঘর বাঁধা এবং ঘরের লক্ষ্মীকে প্রতিষ্ঠার আয়োজনে এই উদ্বোধন গীতি ধীরে ধীরে রূপ পায় কত বিচিত্র রূপে! এই ঘরের গৃহিণীই তো কবির স্বপ্ন-প্রদর্শিকা– জীবনদেবতা যে কবিকে মন্ত্র দেয় 'আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া/ বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া।' এই সূত্র ধরে আমরা রবীন্দ্রনাথের অন্তর্গত জীবনদেবতাকে জানতে আরো একটু অগ্রসর হতে পারি। *জীবনস্মৃতিতে* কবি লিখেছেন, 'আমার তো মনে হয়, আমার কাব্য রচনার এই একটিমাত্র পালা। সে পালার নাম দেয়া যেতে পারে, সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা।' এই অসীমকে সময়ের মধ্যে বা সীমার মধ্যে দেখবার সাধ্যে সযত্ন সাধনার কি প্রয়োজন হয়নি নানান প্রক্রিয়ায়? সেই প্রক্রিয়ার মূলে থেকেছে জীবনদেবতারূপে আধ্যাত্মিক এক স্বপ্ন-প্রেরণা যার জন্যে তিনি ঘর বেঁধেছিলেন 'অনন্ত এ আকাশের কোলে।' ঘুরে ফিরে বলতে হচ্ছে বিষম ('বিষম' শব্দটি ব্যবহার করলাম কবির প্রতিষ্ঠার সীমা নির্ধারণ করতে অন্য কোন শব্দ না পেয়ে) এক কাব্য প্রতিভাই তাঁকে 'আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে' দাঁড়াবার পথের ইঙ্গিত দিয়েছে এবং চিরকাল তিনি তারই দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন, নিয়ন্ত্রিত হয়েছেন। নিজের ভিতরের নিজেকে চেনার এই উপলব্ধি ছাড়া কি করে সম্ভব হত অন্তর্জগতের গহন গভীর অন্ধকারের ভিতর আপন সীমা বাড়িয়ে অসীমকে পাবার বা বোঝবার আকাঙ্ক্ষায় সারা জীবন পথ চলা? তিনি বললেন, 'আমার সুদীর্ঘকালের কবিতা লেখার ধারাটাকে পশ্চাৎ ফিরিয়া যখন দেখি তখন ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাই– একটা ব্যাপার, যাহার উপর আমার কোন কর্তৃত্ব ছিলো না। যখন লিখিতেছিলাম তখন মনে করিয়াছি আমিই লিখিতেছি বটে, কিন্তু আজ জানি কথাটা সত্য নহে। কারণ এই খণ্ড কাব্যগুলিতে আমার সমগ্র কাব্যগ্রন্থের তাৎপর্য সম্পূর্ণ হয় নাই– সেই তাৎপর্যটি কী তাহাও পূর্বে জানিতাম না। এইরূপে পরিণাম না জানিয়া একটির সহিত একটি কবিতা যোজনা করিয়া আসিয়াছি– তাহাদের প্রত্যেকের যে ক্ষুদ্র অর্থ কল্পনা করিয়াছিলাম, আজ সমগ্রের সাহায্যে নিশ্চয় বুঝিয়াছি, সে অর্থ অতিক্রম করিয়া একটি অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্য তাহাদের প্রত্যেকের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছিলো। তাই দীর্ঘকাল পরে একদিন লিখিয়াছিলাম–

এ কী কৌতুক নিত্য নতুন
ওগো কৌতুকময়ী।
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই।
অন্তর মাঝে বসি অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।
কী বলিতে চাই সব ভুলে যাই,
তুমি যা বলাও আমি বলি তাই,
সংগীত স্রোতে কূল নাহি পাই–
কোথা ভেসে যাই দূরে।'

তারপরেই বলছেন, 'এই যে কবি, যিনি আমার সমস্ত ভালমন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি 'জীবনদেবতা' নাম দিয়াছি।' – (আত্ম পরিচয়) এই কথা বলার পরে জীবনদেবতার স্বরূপ আরো স্পষ্ট হয় আমাদের কাছে। জীবনদেবতা অলৌকিক কোন দেবতা নয় সে এই মাটির জগৎ থেকেই উদ্ভূত। এই জগৎ ও জীবনের প্রতিদিনকার উছলে-ওঠা লীলারাশি ছন্দে ছন্দে গাঁথা মালার মত মুহুর্মুহু জলে স্থলে গগনে উদ্ভাসিত হয়ে কবিকে মুগ্ধই করছে না শুধু তাকে আপন ভিতর পানে টেনে নিয়ে জানিয়ে দিচ্ছে তুমিও আমার অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে আছ, তুমি আমারই অভিন্ন অংশ। কবিও তা বুঝতে পারছেন এবং গেয়ে উঠছেন,

'আমার অঙ্গে অঙ্গে বাজায়, বাজায় বাঁশি।
আনন্দে বিষাদে মন উদাসী
পুষ্প বিকাশের সুরে দেহমন উঠে পুরে,
কী মাধুরী সুগন্ধ বাতাসে যায় ভাসি।
সহসা মনে জাগে আশা,
মোর আহুতি পেয়েছে অগ্নির ভাষা।
আজ মম রূপে বেশে লিপি লিখি কার উদ্দেশ্যে,
এল মর্মের বন্দিনী বাণী বন্ধন নাশি ॥'

এই বন্ধননাশিনী এই বিশ্বেরই আনন্দ জগতের লীলাবিহারী এক প্রকাশ– মহাজাগতিক প্রকাশ যা রবীন্দ্রকাব্য প্রতিভাকে স্পর্শ করেছিল সোনার কাঠি দিয়ে এবং এই পরশ কাঠিও মহাজাগতিক পরিক্রয়ার এক অমিত অংশ যা এই মাটির পৃথিবী তার আকাশ বাতাস জল রৌদ্র বর্ষা– ষড়ঋতু-চক্রের গর্ভেই জন্মেছে। এই সোনার কাঠির স্পর্শ কেমন করে তাঁর আঁকা ছবির জগতেও তুলি বুলিয়েছে রঙে রঙে তাও ছোট্ট করে আমরা একবার দেখে নিতে পারি। তাঁর ছবির জগতে ঢুকলে প্রায়ই ছবিতে দেখা যায় ছবির গভীর তল থেকে, কখনো কখনো কালো অন্ধকার তল থেকে বিন্দু বিন্দু আলোর ফুটকির আভা বা ছেঁড়া ছেঁড়া আলোর আভা জেগে উঠছে। আমাদের জীবনের যে অনন্ত অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যৎ তা অন্ধকারে ঢাকা। সে অন্ধকার ভেদ করবার কোন ক্ষমতাই মানুষের নেই। এই নৈরাশ্য মানুষকে যতই নেতিবাচক করে তুলুক না কেন চিন্তার জগতে, অনুভবের জগতে এই বৈচিত্র্যময় মাটির পৃথিবী ও মহাকাশের চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারার অগণন আলোর আনন্দধারায় আমাদের চেতনায় যে আনন্দবোধের সৃষ্টি হয় সেই বোধ-ই ঐ আলোর বিন্দু যা অন্ধকারকে ভেদ করতে চায়, বুঝি দেখাতে চায় আপন স্বরূপকে বা দেখাতে চায় অন্ধকারে ওপিঠে কি আছে! তাঁর চিত্র জগতের রেখায় রেখায় তাই জটিলতর সেই অন্ধকার ভেদ করবার মহৎ প্রয়াস যদিও তিনি ভাল করেই জানতেন ঐ অন্ধকার ভেদ করার কোন মন্ত্র এই সীমাবদ্ধ মানুষের আয়ত্বে নেই, তবু তাঁর বোধের জগতে আলোর মুহূর্ত-স্ফুলিঙ্গগুলি সময়কে পৌঁছে দেয় অপারে।

এখন যে কবিতা চারটি নিয়ে এত কথা সে সম্পর্কে আরো দু'একটি কথা বলে আলোচনাটি শেষ করা যায় (যদিও জানি এ আলোচনা আরো বহুদূর পর্যন্ত এবং বহু সূক্ষ্মতায় বিস্তারিত করা যায়, করা উচিতও তবে এখানে এই সীমাবদ্ধ আলোচনাটুকুই আজ আমার সাধ্যের ভিতরে রয়েছে)। কবিতা ক'টি আলোচনা করে বলতে চেয়েছি বা আমি নিজেও জানতে চেয়েছি যে বাল্যকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনদেবতার আভাস পেয়েছিলেন নিজের ভিতরেই এবং নিজের সেই বোধেরই লালন পালন করেছেন সারা জীবন তাঁর কবিতায়, গানে জীবনদেবতা রূপে।

আমরা তাঁর মহান জীবনের সেই সাধনাকে প্রণতি জানাই বার বার।

জাহানারা নওশিন
লেখক, প্রাবন্ধিক

নিন্দা ও নান্দীর রবীন্দ্রনাথ

গাজী আজিজুর রহমান

রবীন্দ্রনাথকে বলা হয় সপ্তবর্ণা মণি, বলা হয় সাত সাগরের মাঝি, সাত আকাশের স্বর্ণঈগল, সাত অমরার ঈশ্বর– আরো কত ভাস্বরিত ভাবচ্ছবি তিনি; প্রতীপে তিনি চির পুরাতন, অতি-অবাস্তব, অতি ভাবুক, চতুর, নষ্ট চরিত্র, অনুকারক, সামন্ত মনোভাবী– এমনি আরো কত নিন্দা-নান্দীর সাতকাহনের শিকার তিনি। কালে কালে এভাবেই রবীন্দ্রনাথ পাঠকের কাছে রয়ে গেলেন দুরূহ, কুহেলি, দূরতম কোন দ্বীপের মত কত অজানারে।

অথচ রবীন্দ্রনাথকে আমরা কতটুকু জানি আর কতটুকুই বা চিনি। অন্ধের হাতি বা দুধ দর্শনের মত অথবা ঈশ্বরকে দেখা ও জানার মত আমাদের সকল জানা আজও ভ্রান্তিবাসিত, খণ্ডিত, অনুজ্ঞানে অঙ্কুরিত। তবু অনুমানে, বিশ্বাসে-অবিশ্বাসে, সংশয়ে-সন্দেহে, জ্ঞানে-অজ্ঞানে আমাদের সতত চেষ্টা একটি নানা রঙের রবীন্দ্রমালা তৈরি করার। সপ্তকাণ্ড রামায়ণের মত অনেকেই রবীন্দ্র-রামায়ণ লিখে আবিষ্কারের অহংকারে মুগ্ধ। মনে করেন শেষ কথাটি বলা হল, শেষ ছবিটি আঁকা হল। শেক্সপিয়র সম্পর্কেও এমন ভ্রান্ত ব্যাখ্যা আজও বহমান।

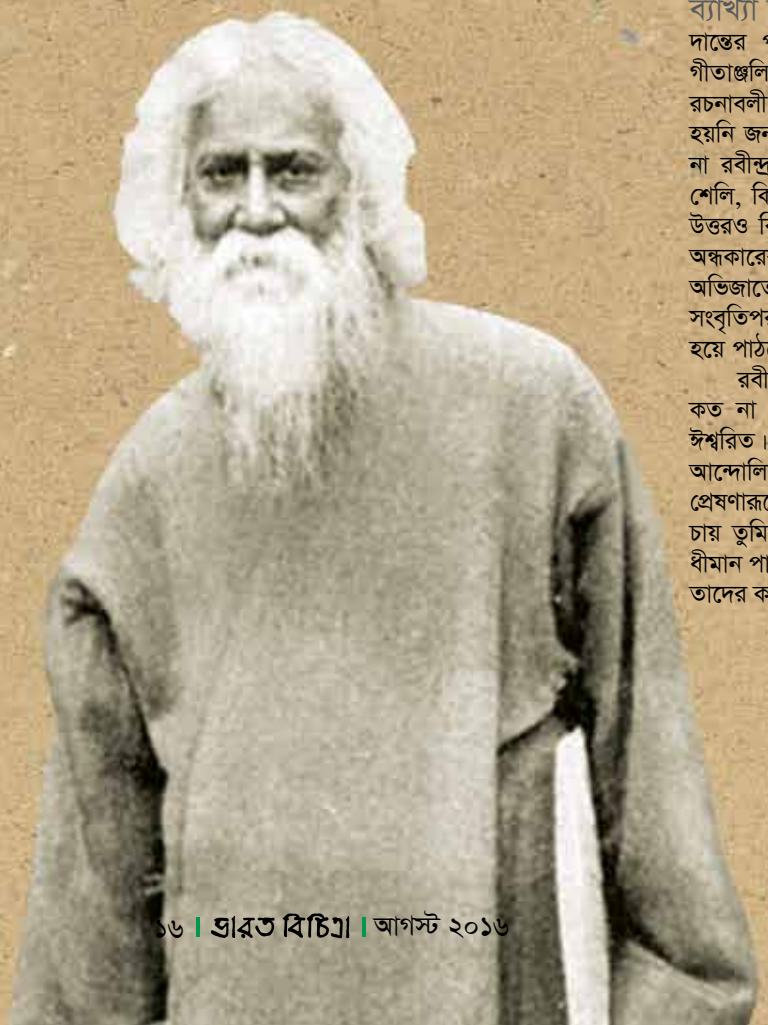

দান্তের পারাদিসো, শেক্সপিয়রের সনেটগুচ্ছ, গ্যেটের কবিতাবলী না রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি শ্রেষ্ঠ– এ প্রশ্ন আজও অমীমাংসিত। আজও মীমাংসা হয়নি ভলতেয়ারের রচনাবলী, রোমাঁ রোলাঁর রচনাবলী, ইয়েট্‌সের সৃষ্টিসম্ভার বড় না রবীন্দ্রনাথের। মীমাংসা হয়নি জন ডান, পল ভালেরি, অডেন, এলিয়টের বিখ্যাত উচ্চারণগুলো শ্রেষ্ট বা সমৃদ্ধ না রবীন্দ্রনাথের। ভাববাদী, শুদ্ধ সৌন্দর্যবাদী রবীন্দ্রনাথ কী প্রি-র‍্যাফেলাইট গোষ্ঠীর শেলি, কিটস্, বায়রন, ক্রোচের সমগোত্রীয় না নব্য হেগেলীয় সম্প্রদায়ের– এ প্রশ্নের উত্তরও বিতর্কিত। মীমাংসা হয়নি বরীন্দ্রনাথ পৃথিবীর আলোকিত কবিদের দেবতা না অন্ধকারের। মীমাংসা কী হবে রবীন্দ্রনাথ সাধারণ মানুষের কবি না কবিদের কবি অথবা অভিজাতের? এ রকম অমীমাংসার কারণ রবীন্দ্রনাথ যতটা স্বচ্ছতার সাধক ততটাই সংবৃতিপরায়ণ। রবীন্দ্র-পক্ষের অন্ধতা এবং রবীন্দ্র-বিপক্ষের অন্ধতায় বিভক্ত ও বিভ্রান্ত হয়ে পাঠকের অভিলক্ষ তাই অগস্ত্যযাত্রা-পরিকীর্ণ।

রবীন্দ্র-অজ্ঞরা অথবা রবীন্দ্র শিক্ষায় শিক্ষিত অধিকাংশ মূর্খরা জানে রবীন্দ্রনাথ কত না সহজ-সরল-নান্দনিক এবং মাঙ্গলিক কবি। তিনি আপাদমস্তক রোমান্টিক, ঈশ্বরিত। তিনি তাদের আত্মার আত্মীয়, জীবন-মৃত্যু জুড়ে পল্লবিত, চেতনে-অবচেতনে আন্দোলিত, প্রতিটি প্রভাত ও রাত্রি মত ভাস্বরিত। দুঃখরূপে, আনন্দরূপে, প্রেরণারূপে, প্রেষণারূপে, প্রণোদনারূপে তিনি হৃদয়ে বিভাসিত, মর্মরিত। যেন 'আমার পরাণ যাহা চায় তুমি তাই'র মত রবীন্দ্রনাথ তাদের অন্তরে আসীন। অথচ প্রকৃত রবীন্দ্র-বোদ্ধা, ধীমান পাঠক জানেন রবীন্দ্র অংকটা অত সরল নয়– সে এক কঠিন জ্যামিতি। রবীন্দ্রনাথ তাদের কাছে আজও সেই সুদূরের নক্ষত্রটি, যার আলো আজও পৃথিবীতে এসে পৌঁছেনি;

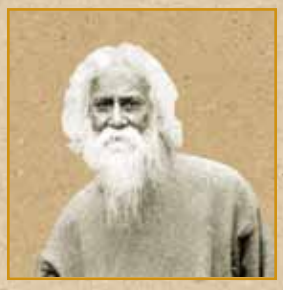

ইয়ুং বলেছিলেন ‘নদী থেকে জল নিতে গেলে একটু নিচু হতে হয়’। রবীন্দ্রনাথকে জানতে গেলে আমাদের অবশ্যই অবনত হয়ে জানতে হবে। সেই কাঠের বোঝা মাথায় কিশোরীর কাছে জানতে চাওয়া বৃথা আকাশের সৌন্দর্য কেমন। রবীন্দ্র-ভক্ত অথবা বিরোধীরা হয় মাথা নিচু না করে জল নিতে চান অথবা কাঠের বোঝা মাথায় চাপিয়ে আকাশ দেখতে চান।

সেই অজানা আলোয় স্নান করে, অবগাহন করে আমরা হয় অতি রবীন্দ্র ভক্ত নয় অতি রবীন্দ্র বিরোধীর ভূমিকায় অবতীর্ণ।

আমরা যে ভীষণভাবে রবীন্দ্র-অজ্ঞ, সেই অজ্ঞতাও টিকে যায় পাঠকের বিপুল অজ্ঞতার কারণে। তাইতো ডি এল রায় পড়ে, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, মোহিতলাল, নীরদ চৌধুরী, মার্কস্‌বাদীদের লেখা পড়ে আমরা বরীন্দ্র-বিদ্বেষী হয়ে পড়ি। আবার যখন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ক্ষুদিরাম দাস, নীহাররঞ্জন রায়, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, আবু সয়ীদ আইয়ুব, দেবেশ রায় পড়ি তখন আমরা নিরবচ্ছিন্ন রবীন্দ্র-প্রেমী হয়ে পড়ি। এই বৈপরীত্যের মাঝে নিরপেক্ষ আলোচনাগুলো হয়েছে ‘ধরি মাছ না ছুঁই পানি’র মত। তাই অসংখ্য রবীন্দ্র-আলোচনা ও বিশ্লেষণ হয়ে পড়ে চর্বিত চর্বণ, একপেশে না হয় ইগো মনোন্যাশিত। তাতে পর্বতের মত উঁচু, আকাশের মত উদার, সমুদ্রের মত গভীর রবীন্দ্রনাথ ঢাকা পড়েন একটা মায়াবী আবরণে। তিনি হয়ে যান অপরিচিত, অভাজন, ক্ষুদ্র, খণ্ড, অবিশ্রুত। তর্কে, ভালবাসায়, ঘৃণায় তিনি হয়ে ওঠেন ব্যক্তির, গোষ্ঠীর, গোত্রের। সমগ্রের রবীন্দ্রনাথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় রবীন্দ্র-ঈর্ষাকাতর একটি গোষ্ঠী, ইসলামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ একটি গোষ্ঠী, মার্কসীয় আলোক-স্নাত অ্যারগ্যান্ট একটি শ্রেণী এবং রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত হবার খায়েসি একটি গোষ্ঠী। তাতে আমরা পেয়েছি ক্ষত-বিক্ষত এক রবীন্দ্রনাথকে। অতি আধুনিকেরা তাঁকে করেছে উলঙ্গ রাজা, অ-বিংশ শতকী। ফলে চূর্ণ হয়েছে তাঁর ‘আমি তোমাদেরই লোক’-এর অহংকার। এভাবেই রবীন্দ্রনাথ আমাদের হাতে নষ্ট হয়েছেন এবং সৃষ্ট হয়েছেন ঈশ্বরে। দু’টোই সৃষ্টি করেছে দূরত্ব। ফলে সাধারণ পাঠকের লোকসান দিন দিন বেড়েছে।

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন, কর্ম ও সৃষ্টি এমনই বিস্ময়কর যে বিস্ময়কেও বিস্ময়ান্বিত হতে হয়! এত বিশাল, বিপুল ও ব্যাপ্ত তাঁর প্রতিভার দশ দিগন্ত যে যা কিছু ছুঁতে যাই না কেন মনে হয় অধরা। ‘এক হো বহু শ্যামে’র মত তাঁর বিভা ও বৈচিত্র্য। সেই নানা রঙের রবীন্দ্রনাথকে আঁকা, বিচার বা বিশ্লেষণ করা এক জীবনে কারো পক্ষে শুধু দুঃসাধ্য নয়– প্রায় অসম্ভব। এটি আবেগ বা উচ্ছ্বাসের কথা নয়। যদি বলি তাঁর কবিতা, নাটক, গদ্য কিংবা তাঁর দর্শন নিয়ে আপনি কাজ করুন তাহলেও কী আপনি সে কাজের শেষ নামাতে পারবেন? পারবেন কী রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিকতা, রবীন্দ্রনাথ ও মানবধর্ম, রবীন্দ্রনাথ ও মৃত্যুচেতনা, তিমিরহননী রবীন্দ্রনাথ, আলোকপিয়াসী রবীন্দ্রনাথ, মঙ্গল-অমঙ্গলের রবীন্দ্রনাথ, দুঃখ-সুখের রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বপথিক রবীন্দ্রনাথ, পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, বিদেশীদের সাথে রবীন্দ্রনাথ, সাগর-নদী ও রবীন্দ্রনাথ, সৌন্দর্যপ্রিয় রবীন্দ্রনাথ, সমালোচক বা অনুবাদক রবীন্দ্রনাথ, অলস ও ছুটির রবীন্দ্রনাথ, শিশুদের রবীন্দ্রনাথ, জীবনদেবতা ও রবীন্দ্রনাথ, গীতিকার রবীন্দ্রনাথ, গণমানুষের রবীন্দ্রনাথ, ছন্দ ও অলংকারের রবীন্দ্রনাথ, সীমা-অসীমের রবীন্দ্রনাথ, অস্পৃশ্যতা ও রবীন্দ্রনাথ, আশীর্বাদক রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি নানা মাত্রিকতায় তাঁকে আবিষ্কার করতে? স্বপ্নের দেশে, কল্পনার দেশে, ব্যক্তি ‘আমি’র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত রবীন্দ্রনাথকেই-বা আমরা কতটুকু চিনি, কতটুকু জানি!

সত্য শিব ও সুন্দরের যিনি আজন্ম আরাধক, স্বপ্ন-রহস্য ও কল্পনা যার আমৃত্যুর উপাসনা, শান্তি-ধীগুণ-ধনাত্মকতার যিনি নিরুদ্দেশ যাত্রী– সেই রবীন্দ্রনাথের ভেতর সংগোপনে বাস করে এক নাস্তিমান পুরুষ, নন্দিত নরকের কবি এবং এক আমাঙ্গলিক শিল্পী। দুর্ভাবনা, দুঃখ, দারিদ্র্য, দহন, দুরাক্ষর, দুর্জ্ঞেয়তা দিয়ে সাজানো যে রবীন্দ্রনাথ– সেই কবিকেই-বা আমরা ক’জন চিনি! যদি বলা হয় বাস্তবতা যাঁর বিদেশ, ভাবুকতা-আধ্যাত্মিকতা, মরমীয়া সংবেদনা যাঁর স্বদেশ– তাহলে সেই রবীন্দ্রনাথকেই-বা আমরা ক’জন জানি! সর্বাস্তবাদিতা, গুরুগিরি, সন্তত্ব, ঋষিত্বকে যদি বলি তাঁর মুখোশ, স্খলনকে আড়াল করার কবচ– তাহলে কী শেষ যুক্তিটি আমরা সংযোজন করতে পারব? দ্বিমুখী রোমান দেবতা জ্যানাসের মত তিনি ছিলেন সকল মানুষের ফটক দ্বারের প্রহরী। যার ভেতর দিয়ে একইসঙ্গে প্রবেশ ও প্রস্থান করা যায়। জটিলতায় তিনি ছিলেন ফাউস্ট ও হ্যামলেটের মত। আর জ্ঞান, বুদ্ধি, কল্পনা, অনুভূতি, বিদ্যা, নীতি ও আদর্শ এবং কাব্যকলা বিশারদ হিসেবে ভার্জিলের পর রবীন্দ্রনাথ অদ্বিতীয়। তাই তাঁর সম্পর্কে বলা যায় ‘শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে?’

ঢালাওভাবে বলা হয় পৃথিবীর এমন কোন বিষয় ও বস্তু নেই যা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ লেখেননি। অথচ তিনি কি কি নিয়ে লেখেননি তা নিয়েই একজন গবেষক সারা জীবন গবেষণা করতে পারেন। দেশ-বিদেশে রবীন্দ্রনাথ বার বার বরফের পাহাড় বা তুষারের মধ্যে অবগাহন করেছেন কিন্তু সে সম্পর্কে তাঁর কী অভিপ্রায় জানা যায় কী? কিংবা চির পরিচিত সুন্দরবন সম্পর্কে তাঁর লেখালেখির কোথাও কী পরিচয় মেলে? এরকম আরো কত বিষয়-আশয় আছে যা তাঁর লেখনীর মুখ দেখেনি। তুচ্ছের প্রতি তাঁর একটা হাহাকার ছিল কিন্তু সেই তুচ্ছ কী জানা যায় না। শুধু বলেছেন ‘তুচ্ছ বলে যা চাইনি তাই মোরে দাও’ (দুর্লভ জন্ম)। অথচ প্রেমেন্দ্র মিত্র বলছেন ‘তোমার পায়ের পাতা/ সবখানে পাতা/ কোথায় রাখি প্রণাম’। আসলে রবীন্দ্রনাথকে কারো পক্ষে সম্পূর্ণত চেনা সম্ভব নয়। কারণ, অজান্তে রবীন্দ্রনাথ নিজের সীমাকে নিজেই অতিক্রম করেছিলেন। গড়ে ছিলেন সকল অনৈক্য ও অসঙ্গতির মাঝে ঐক্যের সুর। সেই সুর ‘যে পারে সে এমনি পারে, পারে গো ফুল ফোটাতে।’ তবু কি রবীন্দ্রনাথ সব ফুল ফোটাতে পেরেছেন, সব আলো জ্বালতে পেরেছেন, টাইরেসিয়াসের মত সব সত্যজ্ঞান লাভ করেছিলেন, সব পাখির সুর বাঁশিতে বাজাতে পেরেছিলেন? পারেননি বলেই অতৃপ্ত, উৎকণ্ঠিত কবিকে বলতে হয়, ‘ও তাঁর অন্ত নাই গো নাই।’ বিশ্বাস, দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের দ্বৈরথী এই রবীন্দ্রনাথ কি আমাদের চেনা?

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সৃষ্টিকে যারা তন্ন তন্ন করে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন– সেই আবু সয়ীদ আইয়ুব থেকে শিবনারায়ণ রায় পর্যন্ত কেউ কি পূর্ণ বিশ্বাসে বলতে পারবেন তাদের মন্তব্যই সঠিক, এর আর পর নেই? না বলা সম্ভব নয়। শেষ পর্যন্ত সবাইকে বলতে হয় বিশ্ব প্রতিভায় তিনি অতুলনীয়, অদ্বিতীয়। বুদ্ধদেব বসু থেকে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, শঙ্খ ঘোষ, পূর্ণেন্দু পত্রী, হুমায়ুন আজাদ– পক্ষ-বিপক্ষের সবারই শেষ উচ্চারণ কান্টের মত বিশ্ব সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে আর ভাবতে না পেরে যেমন বলেছিলেন– এরপর? সব সুন্দর, সুন্দর এবং সুন্দর– তেমনি এরা বলেন রবীন্দ্রনাথ এক অভাবিত অলৌকিক প্রতিভা, এক অন্তবিহীন পথ। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কারের অহং থেকে সবাই শেষ পর্যন্ত পিছুই হটেছেন।

ইয়ুং বলেছিলেন ‘নদী থেকে জল নিতে গেলে একটু নিচু হতে হয়’। রবীন্দ্রনাথকে জানতে গেলে আমাদের অবশ্যই অবনত হয়ে জানতে হবে। সেই কাঠের বোঝা মাথায় কিশোরীর কাছে জানতে চাওয়া বৃথা আকাশের সৌন্দর্য কেমন। রবীন্দ্র-ভক্ত অথবা বিরোধীরা হয় মাথা নিচু না করে জল নিতে চান অথবা কাঠের বোঝা মাথায় চাপিয়ে আকাশ দেখতে চান। অথবা তাদের সামনে রয়েছে পাষাণের মত একটা দেয়াল। তার ওপারে তারা কিছুই দেখেন না। না আলো না অন্ধকার। সেই শূন্যে ঝুলে আছেন মেঘাচ্ছন্ন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু আদতে তা নয়। রবীন্দ্রনাথ পরিষ্কার, আমরাই মেঘাচ্ছন্ন। এই মেঘ সরানোর মত জ্ঞান, শিক্ষা, রুচি, সংস্কৃতি যদি আমাদের পাঠক ও আলোচকেরা অর্জন না করেন, তবে রবীন্দ্রনাথ

থাকবেন আচ্ছন্ন, সংবৃত।

আকাশের সব নক্ষত্র চেনেন এমন লোক যেমন অপ্রতুল তেমনি রবীন্দ্রনাথকে চেনেন এমন লোকের সংখ্যাও তথৈবচ। তাঁর প্রাচুর্যময় জীবন, নক্ষত্র-ভাসিত প্রতিভা, জ্ঞানের চরমতম নিকষিত হেম-এর নাগাল পাওয়া যে কারো পক্ষে দুঃসাধ্য। জীবনানন্দ বলেছিলেন 'সহজ লোকের মতো কে চলিতে পারে/ কে থামিতে পারে এই আলোয় আঁধারে', রবীন্দ্রনাথে প্রবিষ্ট হওয়া তেমনি সহজ নয়, থামারও উপায় নেই। রবীন্দ্রনাথ যেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গল্প– নদীটির মত– যে 'নদীর দু'দিকে দু'টো মুখ/ এক মুখে সে আমাকে আসছি বলে/ দাঁড় করিয়ে রেখে অন্য মুখে ছুটতে ছুটতে চলে গেল'। আমরা বুঝলাম তিনি অমনি করেই আসেন অমনি করেই যান। তিনি ধরা দিয়েও ধরা দেন না। তিনি থেকেও নেই, না থেকেও আছেন। এই সেই রবীন্দ্রনাথ যিনি ষড়ঋতুর মত ফুল ফুটিয়ে, পাতা ঝরিয়ে, ধুলো উড়িয়ে, মেঘ জমিয়ে, নদীর দু'কূল প্লাবিত করে, একতারাতে কান্নার সুর ছড়িয়ে মুখরিত করে রেখেছেন আমাদের স্বপ্ন ও বাস্তবের জগৎ। এর বাইরে পৃথিবীর যত আলো ও অন্ধকার আছে রবীন্দ্রনাথ তারও যুক্ত বেণী। কাছাকাছি আছেন মাইকেল এঞ্জেলো, গ্যেটে ও জীবনানন্দ দাশ। এমন প্রতিভাকে ছোঁয় সাধ্য কার!

রবীন্দ্র-বিচারে নিন্দা ও নান্দীর পাল্লা কোনটি ভারী বলা মুশকিল। তবে জোর করে সাজা নিন্দুকের দল এবং নান্দিকের দল কেউ শ্রদ্ধার পাত্র নয়। সঠিক সমালোচনা নিন্দা-নান্দীর ধার ধারে না। সে উদ্ধার করতে চায় নিহিতার্থ, অর্থ, আবিষ্কার করতে চায় গভীর-গোপন আত্মা, চিহ্নিত করতে চায় আদর্শ-উদ্দেশ্য-গন্তব্য, তুলে ধরতে চায় সার-সত্য-নির্যাস। রবীন্দ্র-আলোচনায় বার বার তার ব্যত্যয় ঘটেছে। ফলে ঈশ্বরতুল্য এই মানুষটিকে আমৃত্যু সহ্য করতে হয়েছে ঈশ্বরবিরূপ নিন্দা ও নান্দীর অত্যাচার। মরেও সে পীড়ন থেকে তিনি রেহাই পাননি। এমন কি বর্তমান শতকের অতি আধুনিক পণ্ডিত ব্যক্তিরাও রবীন্দ্রনাথকে বিকৃত করে ব্যঙ্গ করে অজস্র লেখা লিখে চলেছেন। বাঙালি যে আজও সুশীল ও সভ্য হয়নি, আজও সে ঈর্ষাপরায়ণ, বহু যুগের রক্তের সংস্কারে আচ্ছন্ন– বিদ্যাসাগর সে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন এভাবে– 'এ দেশের উদ্ধার হইতে বহু বিলম্ব আছে। পুরাতন প্রকৃতি ও প্রবৃত্তিবিশিষ্ট মানুষের চাষ উঠাইয়া দিয়া সাত পুরুষের মাটি তুলিয় ফেলিয়া নূতন মানুষের চাষ করিতে পারিলে তবে এ দেশের ভাল হয়।' কিন্তু আমরা যে ভাল হইনি নীরদ চৌধুরীরা তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আমরা যদি বুদ্ধিবৃত্তিক, যুক্তি-তার্কিক ও হৃদয়বান হতাম তা হলে রবীন্দ্র-মঙ্গলে আমাদের শিল্প-সাহিত্য-সমালোচনা একটা শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়াত। রবীন্দ্র-বিরোধিতা করেও একমাত্র বুদ্ধদেব বসুই সেই কাজটি সুচারুভাবে সম্পন্ন করেছেন। আর সবাই বলা যায় নষ্ট ভ্রষ্টের দলে। তারা রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে চেষ্টা করেননি দেশ-কাল ও বিশ্ব পরিস্থিতির পটভূমিতে। বোঝাতে চেয়েছেন প্রাচীনত্ব দিয়ে। তিনি কতটা স্বর্গের কবি আর কতটা নরকের, কতটা আলোর কবি আর কতটা আঁধারের, কতটা শ্রেয়র কবি আর কতটা শ্রেয়হীনের, কতটা হ্যাঁ-বাদী কবি আর কতটা না-বাদী এবং কেন– অন্তর দিয়ে বুঝতে চায়নি কেউ। ফলে তাঁকে সইতে হয়েছে অরুচিকর সমালোচনা আর সহ্য করতে হয়েছে অশ্লীলতার অভিযোগ এবং পাষাণের মত নিশ্চুপ মানতে হয়েছে চরিত্রহীনের অপবাদ। তারপরও রবীন্দ্র-দীপে আলো জ্বালানোর উৎসব চলছে। কারণ রবীন্দ্র-দীপে আলো না জ্বাললে, রবীন্দ্র আলোয় আলোকিত না হলে এ দেশে আজও কেউ কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী-সমালোচক হয় না। রবীন্দ্রপাঠ তাই বাঙালির শাস্ত্র পাঠের মত চলে চিরদিন।

শিকারী শিল্পী জিম করবেট যে বনে শিকার করতেন সেই বনের সব ভূমিতে কি তার পদচিহ্ন পড়েছিল? তেমনি রবীন্দ্রনাথ যে ভুবনে আমৃত্যু বিচরণ করেছিলেন তার সব ভূমিকে কি তিনি ছুঁয়ে যেতে পেরেছিলেন? না পারেননি। পারেননি বলেই তিনি দেবতা না হয়ে মানুষের অভিধা অর্জন করেছিলেন। যে প্রতিমার হাত বা আঙুল ভাঙা, সেই তো আমাদের প্রিয়তম প্রতিমা। রবীন্দ্রনাথ আমাদের আঙুল ভাঙা মাইকেল এঞ্জেলোর মেরির কোলে ক্রুশবিদ্ধ যিশুর 'লা পিয়েতা' নামের সেই দুঃখিত ছবিটি হয়ে থাকবেন কি?

গাজী আজিজুর রহমান
শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক

ঘটনাপঞ্জি ❖ আগস্ট

ঋষি অরবিন্দ

০১ আগস্ট ১৯৩২ ❖ বলিউড অভিনেত্রী মীনাকুমারীর জন্ম
০২ আগস্ট ১৮৬১ ❖ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্ম
০৪ আগস্ট ১৯২৯ ❖ কিশোরকুমারের জন্ম
০৭ আগস্ট ১৮৬৮ ❖ প্রমথ চৌধুরীর জন্ম
০৭ আগস্ট ১৯২৫ ❖ কৃষিবিজ্ঞানী এমএস স্বামীনাথনের জন্ম
০৭ আগস্ট ১৯৪১ ❖ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু
১১ আগস্ট ১৯০৮ ❖ ক্ষুদিরামের ফাঁসি
১২ আগস্ট ১৯১৯ ❖ মহাকাশ বিজ্ঞানী বিক্রম সারাভাইয়ের জন্ম
১৫ আগস্ট ১৮৭১ ❖ ঋষি অরবিন্দের জন্ম
১৫ আগস্ট ১৯২৬ ❖ কবিকিশোর সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্ম
১৫ আগস্ট ১৯৪৭ ❖ ভারতের স্বাধীনতা দিবস
১৫ আগস্ট ১৯৪৭ ❖ অভিনেতা রাখি গুলজারের জন্ম
১৬ আগস্ট ১৮৮৬ ❖ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের মৃত্যু
১৮ আগস্ট ১৯৩৬ ❖ হিন্দি গীতিকার পরিচালক গুলজারের জন্ম
২০ আগস্ট ১৯১২ ❖ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর জন্ম
২০ আগস্ট ১৯৪৪ ❖ রাজীব গান্ধীর জন্ম
০২ আগস্ট ১৯২২ ❖ বিমল মিত্রের জন্ম
২৩ আগস্ট ১৮৯৮ ❖ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম
২৮ আগস্ট ১৮৫৫ ❖ স্বর্ণকুমারী দেবীর জন্ম
২৯ আগস্ট ১৯৭৬ ❖ কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যু
৩১ আগস্ট ১৫৬০ ❖ মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের জন্ম

শ্রদ্ধাঞ্জলি

কাজী নজরুল ইসলাম

স্বতন্ত্র অবলোকন

মলয়চন্দন মুখোপাধ্যায়

কাজী নজরুল ইসলামের জীবন আর কর্ম নিয়ে ভাবতে বসলে একদিকে বিস্ময়, অন্যদিকে বেদনায় দীর্ণ হয় মন। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির ঐতিহ্যে লালিত দ্বারকানাথের পৌত্র বা দেবেন্দ্রনাথের পত্র হিসেবে রবীন্দ্রনাথের হয়ে ওঠার মধ্যে বিস্ময় নেই। কিন্তু বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়ার মত অজ্ঞানধূসর গ্রামে কাজী ফকির আহমেদ আর জাহেদা খাতুনের সন্তান যে ভবিষ্যতে কাজী নজরুল হয়ে উঠবেন, তাতে বিস্ময়ের অন্ত থাকে না আমাদের। বারো বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ উপনয়নের পর পিতৃসান্নিধ্যে হিমালয়ের ডালহৌসিতে বক্রোটা শৈলশিখরে। সেখানে তাঁকে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র চেনাচ্ছেন দেবেন্দ্রনাথ, পাঠদান করছেন উপনিষদ, হাফিজের কাব্য। এর আগে যাত্রাপথে শান্তিনিকেতন দেখলেন তিনি, যা তাঁর মনোভূমি হবে ভবিষ্যতে।

জেলে যেতে হয়েছে তাঁকে স্বদেশ প্রেমমূলক কবিতা লেখার জন্য, আবার জেলে বসেও তিনি কারাগারের অব্যবহার নিয়ে প্রতিবাদে অনশন করেন। হিন্দু-মুসলমান সীমারেখায় বাঁধতে চাননি মানুষকে যে নজরুল, তাঁকেই ব্রাহ্মদের একটি গোষ্ঠী বর্জন করেছিলেন, কেন-না মুসলমান নজরুল বিয়ে করেছেন হিন্দুকন্যা প্রমীলাকে...

ডালহৌসির আগে অমৃতসরে ছিলেন কিছুদিন। স্বর্ণমন্দিরে প্রত্যহ 'গ্রন্থসাহেব' পাঠ শুনছেন বালক রবীন্দ্রনাথ। হাফিজ, শিখধর্ম, উপনিষদ আর জ্যোতির্বিদ্যা চর্চায় এই যে চারমাস কাটল সেখানে, তা পরবর্তীকালে কী যে বিপুল ফল ফলিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের জীবনে!

অন্যদিকে নজরুল, 'দুখু মিয়া' হিসেবে সার্থকনামা যিনি মাত্র ন'বছর বয়সেই পিতাকে হারালেন, ১৯০৮ সালে। পড়াশুনোয় ইস্তফা দিয়ে রুজিরোজগারে নামতে হল নজরুলকে ঐ বয়সেই। হাজী পালোয়ানের মাজারে খাদেমগিরি করছেন দশমবর্ষীয় নজরুল, মসজিদে মোয়াজ্জিনের কাজও করছেন সেইসঙ্গে। সংসারের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বাসুদেবের যাত্রাদলে গান, রেলওয়ে গার্ড-এর বাবুর্চি, আসানসোলে রুটির দোকানে এক টাকা মাসিক বেতনে কাজে যোগ দেওয়া। নজরুল তখন চোদ্দ বছরের, অর্থাৎ ১৯১৩ সাল। এক টাকা মাসিক মাইনেতে রুটির কারখানায় শ্রমিক নজরুল, আর ঠিক সে-বছরেই নোবেল পেলেন রবীন্দ্রনাথ। কী তুমুল বৈপরীত্য! এখান থেকে উত্তরণ ঘটবে নজরুলের, তাঁকে সংবর্ধনা দেবেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সুভাষচন্দ্র বসুর মত লোক, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের অনিঃশেষ স্নেহপ্রীতি লাভ করবেন তিনি, রবীন্দ্রনাথ তাঁর গীতিনাট্য 'বসন্ত' উৎসর্গ করবেন তাঁকে। রুটি-কারখানার নগণ্য কর্মী থেকে এসব পদবীতে আরূঢ় হবেন তিনি দশ বছরের মধ্যেই। দারিদ্র্যের কারণে শিক্ষাজীবন ব্যাহত হয়েছে নজরুলের বারবার, অথচ এরই মধ্যে ফার্সিভাষা আয়ত্ত করেন তিনি। চুরুলিয়া মক্তবের শিক্ষক মৌলবী কাজী ফজলে আহম্মদের কাছে নজরুলের ফার্সি শিক্ষার সূচনা। তাঁর খুড়তুতো ভাই কাজী বজলে করীমও ছিলেন এ-ব্যাপারে উৎসাহদাতা। অন্যদিকে লেটোর দল খোলেন নজরুল। এখানেই তিনি ছন্দে গাঁথা নাটক, কবির লড়াই রচনা করতে শেখেন। আর হিন্দু পুরাণের পাঠও নেবার সুযোগ হয় তাঁর লেটোর দলের অসাম্প্রদায়িক আবহে। হিন্দু পুরাণকে নজরুলের মত বিস্ময়করভাবে আর কোন বাঙালি সারস্বত চর্চাকার ব্যবহার করে যাননি। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথও নয়। কোন্ বৈপরীত্যে থেকে তিনি ফার্সি থেকে হাফিজ অনুবাদ করেন আর তা প্রকাশিত হয় *প্রবাসী*র মত সম্ভ্রান্ত পত্রিকায়, তা আমরা পরে দেখব।

বাজেয়াপ্ত হয়েছে রাজরোষে পড়ে নজরুলের অন্তত পাঁচখানি বই। জেলে যেতে হয়েছে তাঁকে স্বদেশ প্রেমমূলক কবিতা লেখার জন্য, আবার জেলে বসেও তিনি কারাগারের অব্যবহার নিয়ে প্রতিবাদে অনশন করেন। হিন্দু-মুসলমান সীমারেখায় বাঁধতে চাননি মানুষকে যে নজরুল, তাঁকেই ব্রাহ্মদের একটি গোষ্ঠী বর্জন করেছিলেন, কেন-না মুসলমান নজরুল বিয়ে করেছেন হিন্দুকন্যা প্রমীলাকে অথচ ব্রাহ্ম সমাজেরই কেশবচন্দ্র সেন অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়কে সমাজে পরিচিতি ঘটিয়ে দেবার লক্ষ্যে ভাই গিরিশচন্দ্র সেনকে ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ কোরআন শরীফ অনুবাদ করতে বলেন বাংলায়। কেশবের উৎসাহেই কৃষ্ণকুমার মিত্র হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনী লেখেন। কী যে কুৎসিত বিরোধিতা সহ্য করতে হয়েছিল নজরুলকে একের পর এক! স্রেফ বিয়ের কারণে। *প্রবাসী* পত্রিকায় লেখা বন্ধ হয়ে গেল তাঁর, কেন-না পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, যিনি ছিলেন ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের। এসময় *প্রবাসী*রই দোসর হিসেবে *শনিবারের চিঠি* প্রকাশিত হল, সেখানে অত্যন্ত নোংরা ভাষায় নজরুলকে অক্রমণ করা হত একের পর একটি সংখ্যায়। নজরুলের যে যুগান্তকারী কবিতা *বিদ্রোহী*, যেটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে নজরুল বন্দিত হলেন আপামর বাঙালির কাছে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যে কবিতাকে অভিনন্দিত করেছিলেন, *শনিবারের চিঠি*তে কবিতার ন্যাক্কারজনক প্যারডি লিখে প্রকাশ করলেন সজনীকান্ত দাস। নজরুল-বিরোধিতায় এমনকি মাতলেন তাঁর একদা-সুহৃদ মোহিতলাল মজুমদার। 'দ্রোণ-গুরু' কবিতায় মোহিতলাল লিখলেন (নজরুলের অপরাধ, তিনি মোহিতলালকে দ্রোণাচার্য এবং নিজেকে তাঁর 'শিষ্য' বলেছেন তাঁর এক কবিতায়, 'আমি ব্রাহ্মণ, দিব্যচক্ষে দুর্গতি হেরি তোর। অধঃপাতের দেরী নাই আর, ওহে হীন জাতি-চোর!'

বেদনার দহে জন্মেছেন নজরুল, জাহান্নামের আগুনে বসে পুষ্পের হাসি হেসে গেছেন। অ-সাম্প্রদায়িকতার, নারী-পুরুষ ও ধনী-দরিদ্রের সাম্যের কথা বলে গেছেন, সমস্ত জীবনে পেয়েছেন যদিও লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, বঞ্চনা।

নজরুলকে 'বিদ্রোহী' কবি বলে খুবই সংকীর্ণ অর্থে স্থাপন করা হয়। তাঁর মধ্যে ছিল প্রতিভার বিচিত্র আগ্নেয় স্ফুরণ। ব্রিটিশ সেনবাহিনিতে যোগ দিতে হয়েছিল এই একান্ত স্বদেশানুরাগীকে দারিদ্র্যের নিঃসীম চাপে পড়ে। নজরুল-জীবনের এ-এক আয়রনি। ইংরেজ কবি উইলফ্রেড আওয়েনের প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান, কেন-না ইউরোপের সব দেশে তখন conciption বা বাধ্যতামূলকভাবে সেনাদলে যোগ দেবার আইন বলবৎ ছিল। আওয়েন যুদ্ধ করছেন আর ব্যক্তিগতভাবে যুদ্ধ ব্যবস্থাটিকেই নাকচ করছেন 'Futility, Look, Stranger' ইত্যাদি যুদ্ধবিরোধী কবিতায়। যুদ্ধে যোগ দিয়ে যুদ্ধকে এইভাবে আওয়েন অস্বীকার করতে চাইলেন। লিখছেন তিনি, 'My Subject is the pity of war' যুদ্ধ শেষ হবার সাতদিন আগে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু হয় তাঁর। আর আশ্চর্য, পৃথিবীর দুইপ্রান্তের দুই কবি, দু'জনেই ব্রিটিশ সেনাবাহিনিতে যোগ দিয়েছেন, আর আঁকড়ে আছেন রবীন্দ্রনাথকে। আওয়েনের সঙ্গে সর্বদা থাকত *'The Song Offerings'*.

আওয়েন যুদ্ধবিরোধী কবিতা লিখে মনে মনে যুদ্ধকে প্রত্যাখ্যান করলেন, আর নজরুলের ক্ষেত্রে যুদ্ধ আরো তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে এল। এসবের পাঠ না নিলে নজরুল-চরিত্রের ব্যাপকতা বোঝা যাবে না। যুদ্ধে গিয়ে তিনি হয়ে উঠলেন আন্তর্জাতিক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বহ্নিময়তা একদিকে আর তার পাশাপাশি রুশ বিপ্লব আরেক ক্রান্তিকাল। দীর্ঘদিনের জার শাসন উপেক্ষা করে লেনিনের নেতৃত্বে বিপ্লব পরিচালিত হচ্ছে। জারের সৈন্যদল Red Guard জারের আনুগত্য ভুলে যোগ দিচ্ছে লেনিনের বলশেভিক দলে। ব্রিটিশ ভারতীয় সৈন্যরাও রুশ বিপ্লবে অনুপ্রাণিত হয়ে পালিয়ে যোগ দিচ্ছেন Red Guard-এ। নজরুল করাচিতে বসে এ-সব কিছুর খবরই কেবল রাখছেন না, এই ঘটনা নিয়ে লিখে ফেললেন 'ব্যথার দান' গল্প, যে গল্পের নায়ক নুরুন্নবী বেলুচিস্তান, আফগানিস্তান হয়ে তুর্কিস্তান, ককেশাসে গিয়ে লাল ফৌজে যোগ দেয়। উল্লেখ্য, নজরুল 'নুরু' নামেও পরিচিত ছিলেন। নায়কের 'নুরুন্নবী' নাম তাই তাৎপর্যবাহী। নুরুন্নবী গল্পে নায়ক প্রতিবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। সরাসরি সমসাময়িকভাবেই বাংলা গল্পে এতে করে যেমন উঠে এল রুশ বিপ্লব, তেমনি বিপ্লব সম্পর্কে নজরুলের অবহিতি, সাম্যবাদের প্রতি তাঁর অর্ঘ্য নিবেদিত হয়েছে গল্পটিতে। এর পাশাপাশি যদি আমরা মুজফফ্র আহমদের সঙ্গে নজরুলের একান্ত বন্ধুত্বের সম্পর্ক যুক্ত করি, বা ১৯২৫-এ একটি রাজনৈতিক দলগঠনের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে নজরুলের অংশগ্রহণের তথ্যটি বিবেচনায় আনি, তাঁর আন্তর্জাতিকতাবোধ এবং তার সঙ্গে সাম্যবাদ নিয়ে তাঁর নিবিড় অনুধ্যান গোচরে আসবে আমাদের। নজরুল প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলটির নাম 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের শ্রমিক স্বরাজ পার্টি', ইংরেজিতে 'The Labour Swaraj Party of The Indian National Congress'.

নানা বিস্ময়, সংশয় নিয়েও একথা স্বীকার করতে হবে, মানুষ হিসেবে নজরুল ছিলেন অতুলনীয়। কোনওরকম ধর্মের মোহ তাঁকে স্পর্শ করেনি, তার মানে অবশ্য এই নয় যে, তিনি ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন না। তবে ধর্মবিশ্বাসটা মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার। সে-সম্পর্কে আলোচনা অনুচিত। আজকের এই হিন্দু-মুসলমানের যুগে মানুষ হওয়াই বড় সাধনা, আর সেখানে তাঁর সিদ্ধি ঈর্ষণীয়।

এই রাজনৈতিক দল গঠনে নজরুলের সঙ্গী ছিলেন হেমন্তকুমার সরকার, কুতুবউদ্দীন আহমদ, শামসুদ্দীন আহমদ প্রমুখ। এর-ই মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয় *লাঙল* পত্রিকা। পার্টির উদ্দেশ্য, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতের পূর্ণ স্বরাজ। উল্লেখ্য এই ১৯২৫-এই কানপুরে ভারতের প্রথম কমিউনিস্ট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। *লাঙল* পত্রিকাতেই সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মার্কস-এঙ্গেলসের 'কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো' ধারাবাহিক অনুবাদ করেন। গড়ে ওঠে নজরুল-সৌম্যেন্দ্রনাথ সখ্য।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ নজরুলকে তাই আঙিনা ছেড়ে বিশ্বের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে। অন্যদিকে এখানে এসে তিনি ফার্সি চর্চার সুযোগও করে নিলেন। করাচিতে এক পঞ্জাবি মৌলবীর কাছে ফার্সি শিখলেন কেবল তা-ই নয়, নজরুল তাঁর অনুবাদ গ্রন্থ 'রুবাইয়াৎ-ই হাফিজ'-এর ভূমিকায় লিখছেন, 'তাঁরই কাছে ক্রমে ফার্সি কবিদের প্রায় সমস্ত কাব্যই পড়ে ফেলি।' এরই ফলশ্রুতিতে হাফিজ আর ওমর খৈয়ামের অনুবাদ, তাঁর লেখায় অসংখ্য ইরানী অনুষঙ্গ, যা নিয়ে এখনো গবেষণার প্রয়োজন আছে।

তাই বলে নজরুল মানে কেবল 'বাগিচায় বুলবুলি' নয় অথবা 'মোমের পুতুল মমীর দেশের মেয়ে নেচে যায়'-ই নয়। বিশ্ব সাহিত্যে তাঁর কী পরিমাণ অবহিতি ছিল, তা তাঁর প্রবন্ধের পাঠ নিলেই বোঝা যাবে। দস্তয়ভস্কি বা টলস্টয়, হুইটম্যান আর গোর্কি, নুট হামসুন, ইবসেন, রেমন্ট (পোল্যান্ডের লেখক) বা দেলেদ্দা-ও (ইতালীয়) যে নজরুলের অনায়ত্ত ছিল না, তা নিয়ে বিচার করতে বসলে নজরুলের মূল্যায়ন অতি অবশ্যই নবতর মাত্রা পাবে। আবার ইসলামি সংগীত রচনায় শাহেনশা তিনি। আর একই সঙ্গে শ্যামাসংগীতকার। নজরুল এক বিস্ময়।

নজরুল নিয়ে সংশয় ব্যক্ত করি সবশেষে। ১৯৩১-'৩২-এর পর '৪২ পর্যন্ত অর্থাৎ যতদিন কালব্যাধি আক্রমণ করেনি তাঁকে, তিনি কবিতা, সাম্যবাদ, রাজনীতি থেকে দূরে সরে রইলেন কেবল সংগীতকে সঙ্গী করে। শাণিত তরবারির মত যখন তাঁর আছড়ে পড়ার দরকার ছিল ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের অন্তিম পর্বে তখন প্রেম, পূজা, প্রকৃতিতে লগ্ন তিনি। কোন অদৃশ্য অঙ্গুলিহেলন ছিল কি এর পেছনে? সন্দেহ দৃঢ় হয়, আগের কবি-পর্যায়েও তিনি ঘুম ভাঙানিয়া রক্ত তোলপাড় করা গান লিখেছিলেন। কিন্তু এখনকার গান রক্তকে দোলা দেয়, জ্বালা ধরায় না। সন্দেহ দৃঢ়তর হয়, নজরুল বেতারের নিয়মিত সংগীতশিক্ষক ও একইসঙ্গে এইচএমভি-র মিউজিক ট্রেনার। এ দুটোই যে তখন ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠান। বেতারের অনুষ্ঠান করতে গিয়ে সহসা বাক্‌রোধ হয়ে যাওয়া তাঁর, সন্দেহ কি হতে নেই?

নানা বিস্ময়, সংশয় নিয়েও একথা স্বীকার করতে হবে, মানুষ হিসেবে নজরুল ছিলেন অতুলনীয়। কোনওরকম ধর্মের মোহ তাঁকে স্পর্শ করেনি, তার মানে অবশ্য এই নয় যে, তিনি ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন না। তবে ধর্মবিশ্বাসটা মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার। সে-সম্পর্কে আলোচনা অনুচিত। আজকের এই হিন্দু-মুসলমানের যুগে মানুষ হওয়াই বড় সাধনা, আর সেখানে তাঁর সিদ্ধি ঈর্ষণীয়।

মলয়চন্দন মুখোপাধ্যায়
ভারতের প্রাবন্ধিক

বাংলাদেশ-ভারত
মৈত্রী সমিতি

হোমটাউন প্রজেক্ট, লেভেল # ১৬, সুট # ১৫বি
৮৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
E-mail: info@bifs.org.bd, b_ifs@yahoo.com
(জিপিও বক্স # ৭৭৫)
ওয়েবসাইট: www.bifs.org.bd

ABSSI
Association of Bangladeshi Students Studied in India

ভারতে উচ্চশিক্ষা লাভকারী শিক্ষার্থী সমিতি
President: Dr. Dalem Chandra Barman
VC, ASA University, Dhaka
Phone: 01552 334300
Secretary: Shamim Al-Mamun
Phone: 01715 902146

সৌহার্দ

ভারত মাতালো সুরের ধারা

দীপক পাল

সম্প্রতি ভারতের রাষ্ট্রীয় সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বিনিময় ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আইসিসিসিআর (ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশন্স) এর আমন্ত্রণে কলকাতা, লক্ষ্ণৌ এবং দিল্লিতে অনুষ্ঠান করে এল *সুরের ধারা*। আইসিসিআর স্কলার ও শান্তিনিকেতন সংগীতভবনের প্রাক্তনী শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যার নেতৃত্বে *সুরের ধারা* ১৭জনের একটি সাংস্কৃতিক দল নিয়ে ২৭ জুন ২০১৬ ঢাকা ত্যাগ করে। ২৮ জুন কলকাতা রবীন্দ্র সদনে অল ইন্ডিয়া রেডিওর নতুন সম্প্রচার কেন্দ্র উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করে *সুরের ধারা*। রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যার একক রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশনার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। দ্বিতীয় পর্বে *সুরের ধারার* শিল্পীরা পরিবেশন করে ভাষা ও দেশের গান। ভাষা আন্দোলন থেকে আমাদের স্বাধীনতার অভিযাত্রার সাংস্কৃতিক আন্দোলন– বিশেষ করে সংগীতসংস্কৃতি, গণসংগীত ছিল প্রধান প্রেরণাদায়ী শক্তি যার শেষ পর্ব ১৯৭১-এর সাক্ষী কলকাতার বাঙালিরা।

সেদিনের কলকাতায় সংগঠিত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থার গানগুলো *সুরের ধারা*র নবীন শিল্পীদের কণ্ঠে মুগ্ধ হয়ে শোনেন হলভর্তি দর্শক। গানগুলির সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বিপুল করতালির মাধ্যমে দর্শকরা তাদের প্রতিক্রিয়া জানান। অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করে সংগঠনের সমাজের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম 'মিউজিক ফর ডেভেলপমেন্ট'-এর শিশুরা। অনুষ্ঠানটি অল ইন্ডিয়া রেডিও সরাসরি সম্প্রচার করে।

বাংলা গানের পঞ্চকবির অন্যতম কবি অতুলপ্রসাদ সেনের স্মৃতিধন্য শহর লক্ষ্ণৌ। হিন্দুস্থানী সংগীত বিশেষ করে ঠুংরি, টপ্পা এবং কত্থক নৃত্যশৈলীর প্রাণকেন্দ্র হিসেবে খ্যাত ঐতিহাসিক শহর লক্ষ্ণৌতে ৩০ জুন *সুরের ধারা* পরিবেশন করে রবীন্দ্রসংগীতালেখ্য 'গানের ভেলায়'। *গীতবিতানে*র প্রথম গানেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন– 'কান্না হাসির দোল দোলানো পৌষ ফাগুনের পালা তারি মধ্যে চিরজীবন বইব গানের ডালা। এই কি তোমার খুশি আমায় তাই পরালে মালা।' রবীন্দ্রনাথ গানকে সুরকে উপজীব্য করেছেন তাঁর জীবনব্যাপী সৃষ্টির পথে। গান, সুর, বাঁশি শব্দগুলি বার বার এসেছে তাঁর পূজা, প্রেম, প্রকৃতি, স্বদেশের গানে। রবীন্দ্রনাথের সুরবিষয়ক কিছু গান এবং এই গানগুলো সম্পর্কে শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যার উপলব্ধির ব্যাখ্যা ভাষায় সাজানো হয় 'গানের ভেলায়' আলেখ্যে। অতুলপ্রসাদ সেন প্রতিষ্ঠিত শতবর্ষ প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী 'বেঙ্গল ক্লাবে' সহস্রাধিক দর্শক-শ্রোতার উপস্থিতিতে পরিবেশিত হয় 'গানের ভেলায়'। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা, ভাষ্যপাঠ এবং *সুরের ধারা*র শিল্পীদের সঙ্গে সংগীত পরিবেশনে অংশ নেন বন্যা। নৃত্য পরিবেশন করেন 'মিউজিক ফর ডেভেলপমেন্ট'-এর শিল্পীরা। অনুষ্ঠান শেষে বেঙ্গল ক্লাব কর্তৃপক্ষ শিল্পীদের হাতে শুভেচ্ছাস্মারক ক্রেস্ট তুলে দেন। *Times of India*-র উত্তর প্রদেশ সংস্করণে অনুষ্ঠানটি প্রশংসিত হয়।

*সুরের ধারা*র এই সাংস্কৃতিক যাত্রা শেষ হয় ২ জুলাই দিল্লির আজাদ ভবনে আইসিসিআর মিলনায়তনে 'গীতাঞ্জলির গান' পরিবেশনার মাধ্যমে। হল উপচে পড়া (উপচে পড়া এই অর্থে যে, আসনের অতিরিক্ত প্রচুর শ্রোতা সিঁড়িতে বসে অনুষ্ঠান উপভোগ করেন) দর্শক-শ্রোতার উপস্থিতিতে পরিবেশিত হয় এই গীতিআলেখ্যটি। রবীন্দ্রনাথের বাংলা *গীতাঞ্জলি* পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত নোবেল বিজয়ী গীতিসংকলন ইংরেজি *গীতাঞ্জলি* অর্থাৎ *Song Offerings*-এর গান এবং এর বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা দিয়ে সাজানো 'গীতাঞ্জলির গান' পরিবেশন করেন রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা ও *সুরের ধারা*র শিল্পীরা, নৃত্যে যথারীতি 'মিউজিক ফর ডেভেলপমেন্ট'-এর ক্ষুদে শিল্পীরা। গানের ফাঁকে ফাঁকে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করেন সংগঠনের মধ্যমণি শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা। মুহুর্মুহু করতালির মাধ্যমে শ্রোতারা তাদের মুগ্ধতা প্রকাশ করেন।

দেশের গান ও রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে কলকাতা, লক্ষ্ণৌ এবং দিল্লি মাতিয়ে ফিরল *সুরের ধারা*। প্রতিবেশী রাষ্ট্রে উজ্জ্বল করল দেশের মুখ। প্রতিটি আয়োজনের শেষে শিল্পীরা পরিবেশন করেন বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত।

দীপক পাল
সংগীত শিল্পী, সংস্কৃতিকর্মী

শ্যাওড়াপাড়া

শ্বেতা শতাব্দী এষ

আগারগাঁও পার হয়ে আরেকটু সামনে শ্যাওড়াপাড়া–
এইখানে একটি গলিতে, যে-কোন বাড়ি নয়, যে বাড়ির পাশ দিয়ে
উদ্বেল বাতাস আর রঙের মনোমালিন্যে ছায়া ঘিরে থাকে,
যে বাড়ির সম্মুখে ও ডানপাশে নতুন বাড়ি তৈরি হয়,
যে বাড়িতে একজন থাকে অথচ বাড়িটা, তার নয়!
সে দেখে– কী ভাবে সময় গলে যাচ্ছে, প্রতিবাদ প্রতিবাদ বলে,
প্রধান সড়ক ধরে মিছিল চলে যায়, সেই সাথে চলে যায় তরকারিওয়ালা,
আজ-কাল-পরশু করলা-আলু-পটল, সে কেনে অথবা কেনে না,
তিনতলার জানালা দিয়ে দেখে– মিছিল চলে যায়, লোকেরা বাড়ি বানায়,
এবং বাচ্চাদের খেলতে না-পাওয়া সময় নিয়ে শৈশব চলে যায়–
মিরপুর দশ থেকে আরেকটু পেছনে শ্যাওড়াপাড়া,
শ্যাওড়াপাড়ায় বর্তমানে অসুখ বাস করে!

ঋতুটি বর্ষাকাল

অভিজিৎ বিশ্বাস

একটি ছাতায়
আশ্রয়দাতা

বহুদিন পর
ক্লিন্ন বিষাদ

এসব যদি
খিচুড়ির সাথে

স্যাঁতসেতে ঘরে
আজ যদি জোটে

চোখের কোণের
জল সে কোথায়

তবুও জীবন
বর্ষা ফলক

ভাসছে পৃথিবী
মায়াবী শহর

শরীরে শরীর
ধুয়ে ফেলে মেঘ

ষড়যন্ত্র হয়
ডিমভাজা পাতে

কিছু ধ্বনি জাগে
কাল পেটে কিল

হীরক কুচিতে
জমতে জমতে

ভালবাসা মাখে
রামধনু আলো

নিকষ অন্ধকার
সময় স্তব্ধতার।

ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমি
আগুন পরশমণি।

ঋতুটি বর্ষাকাল
গোবিন্দভোগ চাল।

গন্ধ জেগেছে সাথে
শাকান্ন শেষ পাতে।

জমেছে অনেক জল
সমুদ্র সম্বল।

রোদ্দুর মাখে গায়
মেদুর এ বরষায়।

অভিজিৎ বিশ্বাস ভারতের কবি

বৃষ্টি

মলয়চন্দন সাহা

বাদল আমার মা–
সেজুঁতি আয়োজনের প্রাক্কালে
নিলীমায় কাজল কালো কেশ বিন্যাসে
রবির শোষণ আড়াল হতেই–
সুখবাস এ্যাপার্টমেন্টের ঝুল বারান্দায়।

অবিচল বটগাছ ধ্যানমগ্ন,
পিঁপড়েদের সচকিত সুড়সুড়ি
বাদল পোকার উড়ন্ত আলপনা
নিশাচর বিহঙ্গের আনন্দভোজ।
মা ব্যস্ত শৃঙ্গারে, অন্তরালে...

হীরক জ্যোতিতে মা এলেন
নূপূর পায়ে, মডার্ন অর্কেস্ট্রায়
শ্বাস-রোধ অপেক্ষা ভেঙে!
–প্রজাতি ভুলে
তাল সুপারির নৃত্য-আলিঙ্গন...
উঠোনে ল্যাংটা শিশুদের স্বস্তি-স্নান।

মলয়চন্দন সাহা
ভারতের কবি

আত্মার ওড়াউড়ি

শিহাব সরকার

আত্মারা কী ভীষণ আলোঝলমল জ্বলে
যেন মানুষের জ্যোৎস্না-স্নাত মর্মকথা

মহাতমসায় ছায়াপথ থেকে ছায়াপথে
ওরা উড়ে যায় জোনাকগুচ্ছ?
নাকি মধ্যদুপুরে কালো কালো টেনিস বল–
উর্বশী, মেনকারা ছলছল হেসে ছুঁড়ে মারে
হতচকিত দেবদূতের দিব্যজালে

আত্মা দেখা যায়, দগ্ধ আত্মার ভিতরে
কেউ জলকল্লোল শোনে, বনে গিয়ে যোগী হয়
আমি আত্মা দেখি নিয়মিত,
পুণ্যাত্মা, দুরাত্মা দেখে দেখে মনে শ্যাওলা জমেছে
পরমাত্মার আলো নবজাতকের ললাটে।

মৃত্যুর পর নিজেকে দেখব নাকি
শোকের বাড়ির বারান্দায় সাদা চাদরে মোড়া
পুরো বাড়িতে তখন আত্মার ওড়াউড়ি
পাখিরা সব সাদা কালো মথ

অর্কিডের ফুলে এ কোন ভুবনের প্রজাপতি।

রবীন্দ্রনাথ

নুরুল ইসলাম বাবুল

মর্মমূলে তোমার চেতনা আলোড়িত হয় ক্ষণে ক্ষণে;
আমি একাকী হেঁটে যাই তোমার বিশ্বাসে...

শাহজাদপুর থেকে পশ্চিমে রেশমবাড়ির বিস্তীর্ণ ধানক্ষেত
গোহালার ঘাটে রঞ্জিত মাঝির হাঁকডাক
তারপরও একঘণ্টা পায়ে হাঁটা
আমি আসি রাতের আঁধার ঠেলে ঠেলে
আসে তোমার প্রেরণা সূর্যের সুসংবাদে;
বিলচান্দকের এক জীর্ণ কুটির রবির চেতনা চেনে।

সন্ন্যাসী

রবিউল হুসাইন

ঘাস ফড়িং-এর চোখের সঙ্গে
সুখ ও বেদনার তুলনা বিবেচিত নয়
আন্তরিকতার গভীরে একটু
সান্নিধ্য প্রার্থনায় যদি কোনদিন
নদীটি দুঃখিত হয়ে বেদনার সঙ্গে
হাত মেলায় জলের জল-সঙ্গমিত স্রোতোধারায়
তাহলে কারোর কিছু করার থাকে না

সবার মধ্যেই এক অন্তর্নদী ধীরে প্রবাহিত
মরমের গোপনীয়তায় একটি
সমুদ্র আছে সেইদিকে এগোয়

ঝরোকায় কাক কবুতর গাংচিল ঘুঘু হরিয়াল
ডানা ঝাপটায় বিবিধের সঙ্গে উড়ে উড়ে
সমাহিত ও একীভূত প্রণোদনাময়

এখন খুব কম খরচে জীবনচর্চা হয়
দরিদ্রতা এক কৃচ্ছ্রসাধনের নাম
মানুষ তাই কোনদিন দরিদ্র নয় বিভাময়
গরীবি গর্বিত মহৎ এক পথ-নির্দেশনামাত্র

জীবনকে সহজ করতে শেখায় দারিদ্র্য
নিশিদিন নির্ধারিত অতিবাহিত অবধারিত
অতিপতিত রক্তের সঙ্গে কী কেন অনিবার্য
এক ধারাবাহিকতায় অতঃপর নিরীশ্বরতার মার্গীয়
অস্তিত্ব-বোধ স্বপ্নহীনতার উচ্চাসনে যায়

জীবন স্বপ্নময় হলে দুঃস্বপ্নের মৃত্যু হয়
না যদি বাঁচি তাহলে কীসের জীবন কীসের মরণ

জীবন কখনো বাঁচার অধিক হতে পারে না
মরণও অস্তিত্বের সমানুবর্তী নয় সচেতন
বাঁচা আর মরার মাঝে সবুজ প্রান্তরটিই জীবন

প্রেম

অপর্ণা পাণ্ডে

প্রেমময় জগৎ অতিশয় মধুর
প্রেমহীন বিশ্ব মরুভূমি উষর।
মানুষের সৌন্দর্য তার গুণে নিহিত
ফুলের সৌরভে যেমন ভ্রমর বিমোহিত।
সমুদ্রের জলরাশি মেটায় না তৃষ্ণা পথিকের
মূল্যহীন জ্ঞান অসার– অকল্যাণকর সমাজের
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল অন্ধকার রবির কিরণবিহীন
জ্ঞান ধন শক্তির প্রয়োগ ছাড়া জীবন অর্থহীন
মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ছাড়া জগৎসংসার অচল
নিঃস্বার্থ প্রেম ছাড়া পৃথিবী সত্যিই বিকল
শূন্যতা থেকে জন্ম বিশাল ধরিত্রীর–
অহং ভুলে তাঁর সমান হবার সাধনা
যোগায় প্রেরণা জগৎজোড়া পরিবারের।
অক্ষয় সত্য আমাদের মনে রয়–
প্রেমের ডাকে সাড়া প্রদান
ঈশ্বরের দর্শনলাভেরই সমান ॥

অনুবাদ সিফাত-ই-ইলাহী

অপর্ণা পাণ্ডে
ভারতের কবি

ব্যর্থতার গল্প

চিন্ময় কর

বাস্তবে নয়, স্বপ্নাতুর মনের কল্পিত কবি আমি
বাণীর আঙিনায় পাইনি প্রবেশাধিকার।
শুধু লিখে লিখে খাতা বোঝাই
লিখি– কাটি–, লিখি আরবার।

ডাকের কর্মচারী, সে ও চিনে ফেলেছে
মুচকি হাসে, শুরু হল ফের আনাগোনা!
পত্রিকা অফিস, পরিচয় দিতেই সম্পাদকের
ভ্রূ কুঁচকে যায়, কণ্ঠে তীব্র বিরক্তি।
রোদে ঘোরাঘুরি, জ্বরে কাহিল
গায়ে নেই একফোঁটা শক্তি।

কলেজে একগাদা পাওনা, পরীক্ষা আসন্ন
টাকা চাই গার্জেনের কাছে।
পাগলামি চলমান–
ওদের তিরস্কার মিছে।

এভাবেই চলে নির্বোধ বামনের
চাঁদ ধরার অক্লান্ত ব্যর্থ সাধনা।
সবার কাছে হাস্যস্পদ
বে-আক্কেলটার তবু নেই কোন মর্মযাতনা।

আরশিনগর

ভারতবিহার বৃত্তান্ত

মো. আল-আমিন

বর্তমান বিশ্বে একটি অন্যতম শক্তিশালী ও প্রভাবশালী দেশ হিসেবে ক্রমেই শক্ত অবস্থানে পৌঁছে যাওয়া ভারত এতদঞ্চলে সবাইকে বিশেষভাবে কৌতূহলী করে। তরুণ প্রজন্মের একজন হিসেবে আমাকে বার বার উৎসাহী করেছে ভারত। তাই ভারত সফর ছিল আমার কাছে স্বপ্নের মত। এই স্বপ্নপূরণের বার্তা এল বাংলাদেশ স্কাউটসের মাধ্যমে। উদ্দেশ্য ভারতীয় স্কাউটস এন্ড গাইডস আয়োজিত অষ্টাদশ আন্তর্জাতিক এ্যাডভেঞ্চার প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ। ভিসা পেয়েই মনে হল যেন শাশ্বত ভারতের সুমহান ঐতিহ্যের সঙ্গে আমরা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়েছি। বাংলাদেশী প্রতিনিধিদলে ছিল ৭জন রোভার স্কাউট ও ২জন রোভার স্কাউট লিডার। অনেক প্রতীক্ষার পর ৩০ জানুয়ারি, ২০১৬ ভারতের সীমানায় প্রবেশ করেই সমস্বরে হুল্লোড় দিলাম। তারপর কলকাতা।

কলকাতায় ২দিনের সফরে একে একে দেখলাম ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, সায়েন্স সিটি, ইডেন গার্ডেন প্রভৃতি। এক ফাঁকে কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় ঢুঁ মারলাম। মধ্যপ্রদেশের পাঁচমারি উদ্দেশে রওনা দেয়ার জন্য আমরা হাওড়া রেল স্টেশনে পৌঁছাই। পথে নজর কাড়ে গঙ্গার ওপরে হাওড়া ব্রিজ ও সল্টলেকের মনোরম দৃশ্য। দীর্ঘ রেল ভ্রমণ শেষে আমরা ১ ফেব্রুয়ারি রাতে মধ্যপ্রদেশের পাঁচমারিতে পৌঁছাই। ভারতের অন্যতম বৃহত্তম রাজ্য মধ্যপ্রদেশ-ভারতের হৃদয়ভূমিও বটে। পাহাড় ও পর্বতমালার স্নিগ্ধ পরিবেশের সঙ্গে নানা অভয়ারণ্যের নিজস্ব সৌন্দর্য ও সেই সঙ্গে শত-সহস্র বছরের ইতিহাসের নানা স্বর্ণযুগের স্মৃতি-নিদর্শন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে মধ্যপ্রদেশের সর্বত্র। মধ্যপ্রদেশের পাঁচমারিকে বলা হয় ট্রেকারদের স্বর্গরাজ্য। এখানেই গড়ে উঠেছে ভারত স্কাউটস এন্ড গাইডসের জাতীয় এ্যাডভেঞ্চার ইনস্টিটিউট। প্রতিবছর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এ্যাডভেঞ্চার প্রোগ্রামগুলো এখানেই অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় এ্যাডভেঞ্চার ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে পৌঁছার পর প্রোগ্রাম আয়োজকদের উষ্ণ অভ্যর্থনায় সিক্ত হলাম। ইনস্টিটিউটের বিপি মেমোরিয়াল গাইডস ভবন আমাদের পরবর্তী ৭ দিনের ঠিকানা। পরদিন সকালে রিপোর্টিং শেষে সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত এ্যাডভেঞ্চার প্রোগ্রামের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ৫৫৩জন ভারতীয় অংশগ্রহণকারী ও আয়োজকদের সামনে আমরা গাইলাম– ধনধান্য পুষ্প ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা...।

২ থেকে ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এ্যাডভেঞ্চার প্রোগ্রামে আমরা ট্রেকিংয়ের ফাঁকে ফাঁকে বিখ্যাত রীচগড় (পাথুরে গুহা), ডাচেস জলপ্রপাত, পাণ্ডবগুহা, জাতীয় সাতপুরা পার্ক, জটাশঙ্কর মন্দির, বটেচ্চার উপত্যকা ঘুরে দেখলাম। প্রোগ্রামের সবচেয়ে কঠিন কাজ ছিল দড়ি বেয়ে উঁচু পাহাড় থেকে নামা। কিন্তু তরুণ যুবাদের কাছে তাও ছিল অনেক বেশি উপভোগ্য। বিভিন্ন দিনে আমরা বোটিং, তীর নিক্ষেপ, ঘোড়া চালনা, পিস্তল ও রাইফেল শ্যুটিং প্রভৃতি কাজে অংশগ্রহণ করি। সারাদিনের ক্লান্তিকে ভারতীয় বন্ধুরা মুছে দেয় তাঁবুজলসা অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মাধ্যমে।

বৈচিত্র্যময় ভারতীয় সংস্কৃতির নান্দনিক উপস্থাপনা আমাদের মোহাবিষ্ট করে রাখে প্রোগ্রামের কয়েকটি দিন। ভারতীয় বন্ধুদের বিশুদ্ধ অতিথিসেবার পরশ পেয়ে আমাদের প্রোগ্রামের ষোলআনা পূর্ণ হয়। মহা তাঁবুজলসা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ভারত স্কাউটস এন্ড গাইডসের প্রধান জাতীয় কমিশনার বি আই নাগারালে বলেন, 'দুই দেশের সাধারণ জনগণের চরিত্র এবং সংস্কৃতিতে ব্যাপক মিল রয়েছে। ভারত ও বাংলাদেশ একই সঙ্গে উন্নতির পথে হাঁটতে পারে। এজন্য দু'দেশের সরকার ও জনগণের পরস্পরকে জানা ও বোঝা একান্ত প্রয়োজন। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক এ্যাডভেঞ্চার ক্যাম্প ভারত স্কাউটস এন্ড গাইডসের ছোট প্রয়াসমাত্র, শেষদিন আমরা ভারতীয় বন্ধুদের সঙ্গে স্কার্ফ, ওয়াগল, ব্যাজ, মুদ্রা ও অন্যান্য স্মারক দ্রব্য বিনিময় করলাম।

৮ ফেব্রুয়ারি সমাপনী অনুষ্ঠান শেষে আমরা দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। সেখানে ভারত স্কাউটস এন্ড গাইডসের জাতীয় সদর দফতরের অতিথিশালায় এসে উঠলাম। দিল্লিতে ৩দিন অবস্থানকালে লাল কেল্লা, মহাত্মা গান্ধী সমাধি, সংসদ ভবন, ইন্ডিয়া তোরণ, ইন্দিরা গান্ধী জাদুঘর, কুতুব মিনার, দিল্লি জামে মসজিদের স্থাপত্যশৈলী, সৌন্দর্য ও নান্দনিকতা আমাদের মুগ্ধ করে। এরই মধ্যে আগ্রায় গিয়ে দেখে এলাম তাজমহল, আগ্রা দুর্গ, ফতেহপুর সিক্রি– এ যেন বছরের পর বছর শুনে আসা আশ্চর্যকে নিজের চোখে দেখা।

১২ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় ফিরে এলাম। কলকাতা থেকে মাতৃভূমি বাংলাদেশে পৌঁছনো অবধি মনের মধ্যে হাজার রকম ইচ্ছে, অনুভূতি আর স্বপ্নেরা ভিড় করেছে। প্রতিবেশী দেশের সফলগাঁথা খুব কাছ থেকে দেখে নিজের দেশের জন্য দায়িত্ব অনুভব করেছি। মনে মনে বলেছি, আমরাও পারব। এই ১৪ দিনের ভ্রমণে আমরা ভারত প্রজাতন্ত্রের যে আন্তরিক ও সৌহার্দপূর্ণ মনোভাবের পরিচয় পেয়েছি, শাশ্বত ভারতবর্ষের যে সুমহান ঐতিহ্যে আমরা ঋদ্ধ ও পরিপুষ্ট হয়েছি তার জন্য ভারত সরকার, ভারতীয় স্কাউটস এন্ড গাইডস এবং ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনের কাছে কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

মো. আল-আমিন
শিক্ষার্থী, প্রাক্তন সিনিয়র রোভার মেট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপ

ছোটগল্প

কবি, আলেকজেন্ড্রা ক্যাসেল এবং একটি নারীমূর্তির গল্প

শাহীদা হোসেন রীনা

স্ফুরিত দৃষ্টিতে কুয়াশার আঁধার নামে, হঠাৎ আবছা ছায়ায় শূন্যতার এ কী মহামায়া! কিন্তু তারপর তিনি, হ্যাঁ, ভক্তদের বিগলিত হাসিসহ কথোপকথন, দৃশ্যত বিকেলের শেষ রোদে বসন্তের ঝরা ফুল-পাতা-ধুলোর উড়োউড়ির সঙ্গে কোকিলের কুহু শব্দও শ্রবণেন্দ্রিয় কর্ণকুহরে প্রবেশ করে ক্ষণিকের জন্য সকচিত করে তোলে তাকে, এরপরও নেপথ্যে একরূপ কল্পনা-বিলাস।

মেহগনি আর কদম গাছের বিছানো ছায়ায় দাঁড়িয়ে তাঁর একটু নির্জনতার লোভ জাগে আজ, প্রাণের ভিতর কিসের একরূপ টান পড়েছে, মৃদু সমীরণে মন ছুটে চলতে চায় সাগরাভিমুখে নবীনা

পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী তখন মূর্তিটার কাছে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, কী আছে ওর আদলে? কবিকে কেন আনমনা হতে হচ্ছে ঐ নারীমূর্তির অবয়ব লক্ষ্য করে? কোলকাতায় কতোই তো আছে, দিল্লি-আগ্রা, আর তারপরও কতো দেশ, কতো মহানগরীর শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য– শিল্প দেখার পরও ঐ সাধারণ মূর্তির ভিতর কী অসাধারণত্ব তাই যেন খুঁজে দেখার প্রচেষ্টা প্রতিমা দেবীর।

নদীর মতনই, এসবের মূলে তো এক নারীরই অবয়ব– এই যে সম্মুখে এক পাথুরে নারী মূর্তির মাঝে তারই অপূর্ব প্রকাশ, সন্দেহ হচ্ছে– একে একটু খুঁটিয়ে পরখ করে দেখবার জন্য একাকী হবার একরূপ অদম্য ইচ্ছা হচ্ছে মনের ভিতর, কিন্তু স্বীয় ইচ্ছা পূরণ করা তাঁর এখন আদৌ সম্ভব নয়, তা-তো তিনি জানেনই সম্ভব নয়, তবু ইচ্ছেটা দমছে না, সম্ভব নয় কেন? মনে মনে ক্ষুণ্ন হলেন কবি, ভ্রূ কুচকালেন, হ্যাঁ, বহুদূর থেকে যেন ভেসে আসছে পুরাতন এক পরিচিত পায়ের শব্দ, বাতাসে ভেসে আসছে যেন তারই কণ্ঠস্বর– চমকিত কবির কণ্ঠ কাঁপে– কে– কে–ও! প্রত্যুত্তরে তরল হাস্যের এক মূর্ছিত সুরধ্বনির ধন্দ লাগে– কেন! চেন না?

চমকে ছমক লাগে।

এ-কার ফিস্‌ফাস্‌ কণ্ঠস্বর?

দমকা হাওয়ায় ভেসে যায় তরল হাস্যের পরিহাস।

–আমি চিনি, চিনিগো তাহারে।

ঠোঁটে করুণ মৃদু হাসি।

পুরনো দিনের গল্প।

কবেই তো চুকে গিয়েছে সে সব দিনের হিসাব, তবে...!

পাখির ডানা ঝাপটানোর শব্দে হঠাৎ একটি পালক ঝরে পড়ে পথের সম্মুখে।

যে যায় সে চলে যাক্‌, সব তার নিয়ে যাক্‌,

নাম তার মুছে নিয়ে ॥

বিষাদ এসে ভীড় করে কবির হৃদয়ে। চলে গিয়েছে সে, কবেই তো, শুধু নামটি মুছে যায়নি, হয়তো সময় পায়নি, তাড়াহুড়ো করে চলে যাওয়া তো! দীর্ঘশ্বাস ফেলেন কবি।

বৃদ্ধ লাজলজ্জা ভুলে এবার বেপরোয়া ভঙ্গিতে তাকালেন নারীমূর্তিটির দিকে– কে তুঁহু বোলবি মোয়–।

মূর্তির পাথুরে চোখের দৃষ্টি যেন ছুটে এসে তাকে বিদ্ধ করতে চাইছে, শরবিদ্ধ পুরুষ রক্তাক্ত হৃদয়ের কাতরতা গোপন করে নিয়ে কাষ্ঠ হাসি হাসেন। ভক্তগণ মুগ্ধ, মুখে মুখে কবিতার লাইন তৈরি করছেন কবি, কবি তো! কবি মাথা নাড়ছেন, আকুল হয়ে বলছে– শুষ্ক স্মৃতি কেন রেখে গেলে পিছে...।

বাহ্‌-বাহ্‌ চমৎকার।

চমকে উঠে শশীকান্তের মুখের দিকে তাকালেন তিনি।

কী?

স্বল্প হাসিতে মুখ উজ্জ্বল করে উঠে আসেন নিখাদ বাস্তবতায়, তারপরই হঠাৎ কান পাতেন, বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বলেন– ব্রহ্মার পুত্রের শব্দ না! তা ব্যাটা এত গজরাচ্ছে কেন?

সকলেই হেসে ওঠে কবির রসিকতায়, কবিও হাসেন, হাসিতে মুখ ভরে গেলেও দৃষ্টিতে আনমনা ভাব– কী যে হচ্ছে, কী যেন, কী হচ্ছে মনের গহীনে, তোলপাড়!

আকস্মিক– আহ, আঃ... চাপাস্বরে এক নারীর আর্তি হল কি হল না, কবি সচকিত হয়ে মুহূর্তেই নিজের চেতন অবস্থায় ফিরলেন, কিন্তু তারপরই পীড়িত চোখে খোলা আকাশের বারোয়ারি মেলায় হারিয়ে যেতে থাকলেন– ও গো, কে তুমি বসিয়া উদাস মুরতি, বিষাদ শান্ত শোভাতে– হঠাৎ নারী কণ্ঠ নিঃসৃত হাসি তাকে বিপর্যস্ত করে ফেলে, খুব– খুব বিষণ্ন দৃষ্টিতে ফিরে তাকাতেই গৌরীপুর জমিদারতনয়া হেমন্তবালাকে দেখতে পান, হাঁফ ছেড়ে স্মৃতি থেকে উঠে আসেন কবি, হেমন্তবালা হাতজোড় করে নমস্কারের ভঙ্গি করে বলে– অবশেষে এলেন রবিদা, আমরা জল্পনা-কল্পনা করছিলাম আপনি আসবেন কি আসবেন না।

বোধ করি হেমন্তবালা কবির পূর্বপরিচিতাই শুধুমাত্র নন, প্রিয়ভাজনও বটে, কবির সহাস্যমুখে সে-রূপ সৌজন্যই ফুটে উঠেছে, কবি হেসে হেসে মাথা দোলালেন– এলামই-তো, আসবই-বা না কেন? সখি ভালবাসা কারে কয়, তা জানি না, কিন্তু কেউ ভালবেসে ডাক দিলে সাড়া না দিয়ে পারি নে। তোমরা ময়মনসিংহবাসীরা ভালবেসে ডাক দিয়েছ, আর আমি না এসে পারি!

জমিদারতনয়া কবির কথায় হাসছেন। সুন্দরী সে, হাসিতে মুক্তো ঝরে যেন, কবি, সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন– তো তুমি কখন, কিভাবে এলে?

বর্ষীয়ান কবির দিকে তাকালেন হেমন্তবালা– কী-এক ব্যথা কবির দু'চোখে, না হেমন্তবালার মনের ভুল, কী জানি! কবি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন, তাড়াহুড়ো করে উত্তর দেয় হেমন্তবালা– এই তো ঘোড়ার গাড়িতে, এসেছি তো কতক্ষণ, এসে দেখি ধ্যানী হয়ে তাকিয়ে আছেন আপনি আকাশের দিকে, তারপর ঐ মূর্তির দিকে– মনে হচ্ছে কোন নতুন প্লট পেয়েছেন! লিখবেন নাকি এ-বাড়ি, মূর্তি, ময়মনসিংহের সফর এ-সব নিয়ে কিছু?

কবি হাসছেন মৃদু মৃদু।

মাথা নাড়েন তিনি অনেকটা দোলানো ভঙ্গিতে। শুভ্র শ্মশ্রুগুম্ফে ঢাকা মুখে কী-এক আশ্চর্য যৌবনের স্থিরতা। এর নামই কি যাদু? দৃষ্টির তীক্ষ্ণতায় মহাশক্তির প্রবল যে আকর্ষণ তা যে-কোন তরুণকেও হার মানায়– কবির দু'চোখে এখন সুন্দর আলো ফুটে উঠেছে, তিনি হেমন্তবালার দিকেই দৃষ্টি ফেরালেন, বললেন– হ্যাঁ লিখব বোধ হয়, এখন শরীর কাবু হয়েছে তাই আগে থেকে জোর দিয়ে কোন শপথ উচ্চারণ করতে পারিনে, তবে অসাধারণ ঐ নারীমূর্তি, অতুলনীয়!

হেমন্তবালাসহ অন্যরা এবার পাথুরে খোদাই মূর্তি দেখায় মনোযোগ নিবদ্ধ করতে চাইলেও তারা কবির দিকেই ফিরে ফিরে চাইছেন– এ যে মহান কবির বিশাল অস্তিত্ব, ওর সামনে আর সব তুচ্ছ সকলের কাছে... তুচ্ছ!

পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী তখন মূর্তিটার কাছে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, কী আছে ওর আদলে? কবিকে কেন আনমনা হতে হচ্ছে ঐ নারীমূর্তির অবয়ব লক্ষ্য করে? কলকাতায় কতই তো আছে, দিল্লি-আগ্রা, আর তারপরও কত দেশ, কত মহানগরীর শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যশিল্প দেখার পরও ঐ সাধারণ মূর্তির ভিতর কী অসাধারণত্ব তাই যেন খুঁজে দেখার চেষ্টা প্রতিমা দেবীর। কবি হেমন্তবালার দিকে তাকিয়ে সকৌতুকে হাসছেন, তারপর কী মনে করে বলেন– নারী সুন্দরলক্ষ্মী আর কল্যাণময়ীর প্রতীক। তা বাস্তবে হোক বা শিল্পে, কিংবা ধর আমার কাব্যচর্চাতেই– তাতে নারীর একচ্ছত্র আধিপত্য– যাকগে সেসব। তুমি কেমন আছ বল?

– আমি! – ভাল রবিদা, খুব ভাল। এই মুহূর্তে খুব ভাল আছি তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।

কবির ঠোঁটে-মুখে সৌজন্যের হাসি ঝুলছে কিন্তু তিনি আড়নয়নে তাকাচ্ছেন ঐ পাথুরে মূর্তির দিকে– বৌঠানের মুখের গড়নের সঙ্গে কী অপূর্ব মিল! প্রতিমা আঙ্গুল দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে কী পরখ করছে? তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে পুত্র রথীন্দ্রকে দেখে নিলেন, নির্বিকার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে।

– একটু জলটল মুখে দিয়ে নিলে ভাল হত না?

বিদ্রোহের জয়ধ্বজা উড়িয়ে সে নিজস্ব আসন গেড়ে বসেছে, ময়মনসিংহ আসছি শুনে নজরুল বলছিল ও ময়মনসিংহে ছিল। রুটির দোকান থেকে তুলে এনে এক দারোগাসাহেব ওকে পাঠিয়ে দিয়েছিল ময়মনসিংহের কোন এক গ্রামে তার নিজের বাড়িতে, সেখানেই নজরুল আবার পড়াশোনা শুরু করেছিল, তারপর তো ওর যা ছটফট স্বভাব– চলেও গিয়েছিল...

শশীকান্তের অনুরোধ নাকচ করলেন কবি। বললেন– আগে দেখি তো সূর্যকান্তবাবুর তৈরি ক্যাসেলটা।

মহারাজ শশীকান্ত আচার্য বিনীতভাবে মাথা নুয়ে হাসেন।

হেমন্তবালা বললেন– এখানকার স্থানীয় লোকেরা বলে লোহার কুটির ঘর, কিন্তু এর নাম আলেকজান্দ্রা ক্যাসেল। চায়না মিস্ত্রিদের দিয়ে এই বাগানবাড়িটি তৈরি করাতে কত টাকা খরচ হয়েছে এ নিয়ে বহু জল্পনা-কল্পনা মানুষের মনে।

কবি বলেন– অনেক গাছ, দেশি-বিদেশি সব জাতেরই আছে দেখছি, তা পাখিও আসছে অনেক, লৌহিত্যের বাতাস আসছে হু হু করে। তার উপর চায়না মিস্ত্রির হাতের কারসাজিতে অপরূপ নৈপুণ্য– ও ভাল কথা, নজরুল এখানে এসেছিল কোন গ্রামে বলতে পার?

জমিদার আচার্যের ভ্রূ কুঞ্চিত হল, বললেন– নজরুল?

প্রতিমা দেবী কণ্ঠে উষ্মা ঢেলে বললেন– কেন শশীবাবু, নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা নিয়ে এত হৈ-চৈ আর আপনি তার সন্ধান রাখেননি?

– ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে, বল বীর, চির উন্নত– না-কি, ঠিক মনে করতে পরছি না, খুব হৈ-চৈ নাকি?

কবি হাসেন। বলেন– তুমি পড়ে দেখ– বিদ্রোহের জয়ধ্বজা উড়িয়ে সে নিজস্ব আসন গেড়ে বসেছে, ময়মনসিংহ আসছি শুনে নজরুল বলছিল ও ময়মনসিংহে ছিল। রুটির দোকান থেকে তুলে এনে এক দারোগাসাহেব ওকে পাঠিয়ে দিয়েছিল ময়মনসিংহের কোন এক গ্রামে তার নিজের বাড়িতে, সেখানেই নজরুল আবার পড়াশোনা শুরু করেছিল, তারপর তো ওর যা ছটফট স্বভাব– চলেও গিয়েছিল, এখন কলকাতার উল্লেখযোগ্য কবি, তা একদিন যখন নাম করবে তখন নজরুলের সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের ময়মনসিংহের উল্লেখ হবে দেখ।

হেমন্তবালা বলল– আমরা সবাই আপনার কবিতায় মুখ থুবড়ে পড়ে থাকি যে অন্যদের খেয়ালই করতে পারি না।

– তা ঠিক নয় হেমন্ত, আমার সমসাময়িকদের না জানলে আমাকেই পুরো জানবে কী করে?

– তা ঠিক, কিন্তু দাদা আপনার *ঘরে বাইরের* বিমলা তো আমাকে খুব ভাবাচ্ছে– কোথায় পেলেন এরকম অসাধারণ নারী চরিত্রের সন্ধান?

কবি হেমন্তবালার প্রশ্নের ফাঁকে চকিতে চলে গেলেন বহুযুগ আগের সন্ধ্যামেদুর কদম্বতলে, তুই ফেলে এসেছিস কারে, মন, মনরে আমার–। কবির স্মিতহাস্য মুখের দিকে তাকিয়ে কে বলবে কী এক আঁধার আচ্ছন্নের মধ্য দিয়ে পার করছেন বর্তমানের সময়সিঁড়ি, একটি দমকা হাওয়া ছুটে আসে ব্রহ্মপুত্রের শরীর থেকে, কবি সিরিয়াস কণ্ঠে বলেন– সন্ধান পাওয়া খুব কঠিন! আমাদের আশেপাশে এত মানুষের ভিড়ে যে দু'একজন বিমলা নেই তা হলফ করে কেউ বলতে পারে? আরে, প্রমোদ কখন এলে?

প্রমোদ জোড়হাত করে নমস্কার করেন কবিকে। এভাবে হাতজোড় নমস্কারের রীতি প্রমোদ তার কাছ থেকেই শিখেছেন শান্তিনিকেতনে অধ্যয়নকালে, তা হোক, প্রমোদকে অনেকদিন পর দেখে ভাল লাগছে বিশ্বকবির।

– তুমি এখন আঠারবাড়ির জমিদার, না-কি?

প্রমোদ বিনীতভাবে হাসেন। বলেন– জমিদারদের বর্তমান দুরবস্থা তো জানেনই গুরুদেব– সেই রামও নেই, সেই অযোধ্যাও নেই।

– হ্যাঁ প্রমোদ, যুগ-বদলের পালায় রাজা-প্রজা সব মিশে যাচ্ছে– সবার উপর মানুষ সত্য, এই উপলব্ধি যদি করতে পার তবে আর কোন আফসোস থাকবে না মনে।

প্রমোদ মাথা নাড়লেন, বললেন– সেই শিক্ষা আমি শান্তিনিকেতন থেকে নিয়ে এসেছি, শান্তিনিকেতনকে আপনি বিশ্বনিকেতনের রূপ দিচ্ছেন শুনে আজ আমার খুব গর্ব হচ্ছে, আপনি চিন্তা করবেন না খরচপত্রের জন্য, আমরা পূর্ববঙ্গ থেকে একটা মোটা পুঁজির ফান্ড তৈরি করে দেব। কিন্তু গুরুদেব, আপনি আঠারবাড়ি কবে যাচ্ছেন?

– যেতেই হবে প্রমোদ? রথী চাইবে না সফর দীর্ঘ হোক।

হেমন্তবালা বলল– অবশ্য-অবশ্যই যেতে হবে রবিদা, আঠারবাড়ি যাবার পথে গৌরীপুর, সেখানে হোল্ড করে চলে যাবেন আঠারবাড়ি, আর প্রমোদবাবু তো অলরেডি বিশাল আয়োজন করে ফেলেছেন, আপনি না গেলে ওর মুখরক্ষা হবে কেমন করে, সোনার চাবি পর্যন্ত তৈরি হয়েছে, আপনি দ্বার খুলে ঢুকবেন, থাক আমি আর বলব না। প্রমোদবাবু রাগ করছেন...।

কবি ভক্তদের খুনসুটি উপভোগ করছিলেন, আর লোহার কুঠি ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন। বসন্তের ঝরা পাতারা উড়ছে, উড়ছে ফুলের পাপড়ি, পথের ধুলো আর আজ এক দেহহীন আত্মার অতৃপ্ত বাসনা..., কবি আজ খুবই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলেন। সারা বাড়ির বিরাট বিস্তৃত আঙ্গিনা ঘুরে ঘুরে বাঁধানো বেদিবেষ্টিত বটমূলের পাশে এসে দাঁড়ালেন যখন তখন সূর্য পটে বসেছে, কনে দেখা আলোয় বাগানবাড়ির সবই চমৎকার, তিনি মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন আর ভাবছেন, কী ভাবছেন মাথামুণ্ডু তিনিই কি জানেন, হঠাৎ চুড়ির রিনিঝিনি, নারীকণ্ঠের চাপা হাসির ফিসফাস্– সে যেন এসেছে, কবির পাশে দাঁড়িয়েই যেন শ্বাস ফেলল সেই অভিমানী, তারপর বলল–আমি এসেছি।

অভ্যাগত কমিটির কেউ একজন, কে ঠিক খেয়াল করলেন না কবি, শুধু ঘোরের ভিতরই শুনতে পেলেন, গুরুদেব সন্ধ্যায় আপনার সংবর্ধনা অনুষ্ঠান, চলেন জল-খাবার খেয়ে তৈরি হয়ে নেবেন।

মনের ভেতর হঠাৎ খেদের সৃষ্টি হল, মুখ ঘুরিয়ে চলে যাবে যে এসেছে অথচ ফুরসৎ নেই ফিরে তাকাবার, না কবির নিজস্ব কোন ফুরসৎ নেই।

– তুমি তো তাই চেয়েছিলে রবি, ফুরসৎহীন জনপ্রিয়তা। নারীকণ্ঠের তরলহাস্য কানের কাছে শিষ কেটে যায় চুপিসারে একান্তেই কৌতুকস্বরে। কবি আবারও চমকে চমকে তাকান, কে–ও, ও– বৌঠান!

নদীঘেঁষা অশ্রুযুক্ত হাওয়া কবির ললাট ছুঁয়ে উড়ে যায় কোন দিকে কে জানে! ঘোরলাগা দৃষ্টিতেই তিনি তাকান গাছের পত্রবিন্যাসের ফাঁকফোকর দিয়ে নীলিম আকাশের শূন্যতায়– আকাশ ছুঁবি তুই, আকাশ! চল, রবি আমরা দু'জন মিলে আকাশ ছুঁয়ে আসি।

সেদিনও এই আকাশ ছিল, এরূপ বেদীর পাশের ঝরাপাতা পাপড়ির উড়াউড়ি ছিল, আর ছিল নির্জনতাপ্রিয় বিদূষী এক সহচরী, আশ্চর্য রহস্যের ভিতর পথ হেঁটে বাস্তবে চলে আসার কৌশল বোধহয় এই নারীই তাঁকে প্রথম শিখিয়েছিল, নাকি... ঐ বৌঠান ওর কবিতার কাগজ উড়িয়ে দিয়ে বলছেন, না– না রবি, এত আবেগ ভাল নয়, আবেগ আবার কবিতা না খেয়ে ফেলে...। খুব হাসছেন বৌঠান, এলোখোঁপা খুলে গেল, তারপর আর একদিন, সেই বৌঠানই বলল– বাঃ তোমার এই কবিতার কী চমৎকার অন্তমিল, রবি তোমার হাত খুলে যাচ্ছে, তুমি পারছ, তুমি পারবে রবি।

কিশোরকবি তখন প্রশংসা গিলছে।

যেন বৌঠান তাকে বল দিচ্ছেন, বৌঠান তখন সুর ধরেছেন সদ্য

স্বরচিত চরণে...।

ইস্ কি অদ্ভুত তোমার গানের কথাগুলো।

খিল্‌খিল করে হাসছে বৌঠান, সকৌতুকে চোখ নাচায়, বলে– তোমার থেকেও ভাল!

অতীতের ঢেউ বর্তমানের তীরে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে বুদবুদ তুলে বোধ হয় এক সময় স্থির হয়, খুব স্বাভাবিক কণ্ঠে তিনি বলেন– হ্যাঁ বেলা যে পড়ে এল জলকে চল। ওঃ হ্যাঁ, আমার সফরসঙ্গী বিদেশি অধ্যাপকরা কোথায় শশীকান্তবাবু? আপনি ফারমিচি আর তুচিদের খাওয়া-দাওয়ার দিকে একটু বিশেষ নজর রাখবেন, দেশীয় খাবারের ঝালে ওরা ততটা অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি; আর প্রমোদ এখানকার অনুষ্ঠানগুলো আঠারো তারিখের আগে শেষ করা সম্ভব না, তোমার ওখানে উনিশ তারিখে রওনা দেব, তারপর হেমন্তবালা, রথী যদিও চাইবে না সফর দীর্ঘ হোক, তবু আমি আঠারবাড়ি যাবার পথে গৌরীপুর থামব, সেখানে চন্দ্রাবতীর ময়মনসিংহ গীতিকার যে-কোন পালা দেখানো চাই, এখন চল যাই জলখাবার খেয়ে নিই, তারপর, কোথায় আনন্দমোহন কলেজ নাকি শশাঙ্কবাবু...?

তড়িৎগতিতে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি।

ক্ষণিকের জন্য একান্ত করে সময়ের দরকার কবির, কিন্তু সে সময় মিলছে না যখন অগত্যা আর কী করা!

– তুমি তো তাই চেয়েছিলে ঠাকুরপো।

অভিযোগের পুনরাবৃত্তি যেন বাতাসে ঘূর্ণাকারে প্যাঁচ খাচ্ছে। অসহিষ্ণু দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি।

– তাই চেয়েছিলাম?

– হ্যাঁ রবি, তুমি এক লাজুক কবি থেকে বিশ্বকবি হয়ে গিয়েছ। মাথা নত করেন কবি।

– না রবি এত মানুষের ভিড়ে দাঁড়িয়ে আজ তোমার বৌঠানকে খোঁজার কোন মানে হয় না।

– হ্যাঁ আমি আর তুমি, সে বহুদিন আগে, কবি কবি খেলা...।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শেষে গভীর রাত্রি পর্যন্ত চলল সাহিত্য আড্ডা। সেই আড্ডা আবার ভাঙতে ভাঙতে অনেক রাত হল সেদিন। শেষ পর্যন্ত কবিপুত্র রথীন্দ্রের হস্তক্ষেপে আড্ডা ভাঙল, রথীন্দ্র পিতাকে শোবার ঘরে ঢুকিয়ে তাকে ঘুমাবার পরামর্শ দিয়ে আলো নিবিয়ে নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন। ততক্ষণে কবি একা, একবারেই একা হয়ে গেলেন। ঘুমাতে হবে– কাল অনেক সিটিং-মিটিং করতে হবে, আর তাছাড়া মুক্তাগাছার ত্রয়োদশ-সম্মিলনীতে যোগ তো দিতেই হবে... হঠাৎ 'ঘুমাও' বলে ফিস্‌ফিসানো শব্দ হল, হাসলেন কবি, বালিশে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলেনও বোধ হয়, হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়, চোখ খুলে তিনি তাকান, বাতাসে জলের গন্ধ, জলভাঙার শব্দ ছাপিয়ে কান্নার ফিস্‌ফাস্ তুলছে কেউ– কে– কে, কে– সে! বৃদ্ধ কবি বিছানা ছেড়ে জানালার কাছে এসে দাঁড়ালেন, কবি ঠিক বুঝতে পারছেন না তিনি ঘুমিয়ে আছেন, না স্বপ্ন দেখছেন। খুব সৌন্দর্যময় করুণ রাত আজ। কবির মনে হল– কেউ তাকে 'রবি-রবি' বলে ডাকছে, জানেন কেউ নয়, মনের ভ্রম, তবু তিনি মনের গহীন থেকে সেই ডাকের পুনরাবৃত্তি শুনছেন– কে ডাকে!

কবি বেরিয়ে এলেন বারান্দায়, আলো-আঁধারে ঢাকা নারীমূর্তির দিকে তাকিয়ে তিনি ভাবছেন ঐ পাথুরে খোদাই নারীমূর্তির সঙ্গে তিনি বৌঠানের মুখশ্রীর স্পষ্টতর মিল খুঁজে পেয়েছিলেন সেই কি বৌঠান হয়ে এ মুহূর্তে ডাকছে তাকে, হঠাৎ তাগিদ যেন– আমাকে এত ডাকতে হচ্ছে কেন রবি, তুমি কি শুনতে পাচ্ছ না, তুমি কি নিচে নেমে আসতে পার না?

– নেমে আসতে পারি বৌঠান– তুমি আমার প্রথম গুরু, প্রথম বন্ধু ও প্রথম ভালবাসা– আর–

নারীকণ্ঠ খিলখিলেয়ে হেসে বলল– আর, আর কী আমি রবি?

– আর আর তুমি আমার দ্বিতীয় মাতা।

– তবে এখনো উপরে দাঁড়িয়ে আছ কেন রবি? নিচে নেমে এস।

কবি বুঝি নেমে আসছেন, কবি বুঝি নেমে এলেন।

রাতের শেষ অন্ধকারে নীরব রহস্য বাঙ্ময় হচ্ছে ধীরে– দুলে উঠল বুঝি পাথরের মূর্তি, মুখশ্রীতে স্পষ্টত হাসির ভেঙচি ফুটল, কী হচ্ছে তার, হেল্যুসিনেশন ! চোখ বন্ধ করে ফেলেন তিনি, আবার তৎক্ষণাৎ চোখ খুলে দৃষ্টি নিবন্ধ করেন পাথরের মূর্তিটির দিকে– পাথর হাসে না, ছুঁয়ে দেখেন পাথরের শক্ত অচল মূর্তি...।

পাথরে কপাল ছুঁয়ে তিনি মাথা টোকেন অল্প-বিস্তর, বৌঠান!

পাথর ছেড়ে রবি উঠে দাঁড়ান– না, এ পাথর তার বৌঠান নয়, বৌঠান কখনো পাথর হতে পারে না... ঘুরে দাঁড়ান তিনি।

– রবি–!

চকিতে ফিরে তাকান কবি, চমকে ওঠেন, মূর্তির মুখশ্রীতে হাসি দেখতে পাচ্ছেন তিনি, কবিও হাসেন, এক্কেবারে আকর্ণবিস্তৃর্ণ হাসি, তারপর কী হয় জানেন না তিনি– পরদিন খুব ভোরে অভ্যাসবশত ঘুম যখন ভাঙল, নিজেকে বিছানায় শায়িত অবস্থায় দেখতে পান তিনি। কিছুটা বিস্ময়, কিছুটা কৌতূহলী হয়ে তিনি নিচে নেমে আসেন– খুব দ্রুতপায়ে মূর্তির সামনে এসে থমকে তাকান, ভোরের আবেশী আলোয় মূর্তির চেহারা এখন স্পষ্ট, তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, কী আশ্চর্য! এ তো অন্য চেহারা, অন্য মুখচ্ছবির আদলে গড়া পাথুরে মূর্তি যার সঙ্গে কাদম্বরী দেবীর চেহারার মুখচ্ছবির কোন মিল নেই, কবি আবার তাকালেন, ও, হ্যাঁ পাথরে খোদাই যে আঁখি অঙ্কিত হয়েছে তার দৃষ্টিটুকুই শুধু বৌঠানের, ঐ দৃষ্টির কাছেই একদিন তাঁর পরাভব ঘটেছিল, এখনো ঐ দৃষ্টি তাঁকে বিঁধে ফেলতে চাইছে, কবি মৌন হাসেন, ফাল্গুনের ভোরের হাওয়ায় এখানে বেশ শীত শীত ভাব– ক্যাসেলের সমস্ত মানুষ ঘুমিয়ে, এক গভীর নির্জনতায় বিহ্বল হয়ে তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতেই দেখেন খানিক দূরে দাঁড়িয়ে আছে এক মালী, কবি ইশারায় তাকে ডাকেন, সে অবশ্য এতক্ষণ না দেখার ভান করে কবির মূর্তি অবলোকন দেখছিল, আর সে জন্যই কবি ডাকামাত্র ঘাবড়ে গিয়ে একপা-দু'পা করে এগিয়ে আসছিল, কবি নিজেই এগিয়ে গিয়ে তার হাত স্পর্শ করে একটু হাসেন, বলেন– বনমালী, তুমি উপর থেকে আমার গায়ের চাদরটা এনে দিতে পারবে–।

– এনে দিচ্ছি বাবু।

– দাঁড়াও বনমালী, ঐ মূর্তিটি যাকে দেখে গড়া হয়েছিল তাকে তুমি জান?

মালী গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

– বনমালী!

– বাবু! সে-তো মারা গেছে বাবু।

– মারা গেছে! কি হয়েছিল?

– কিছু না, নিজের জীবন সে নিজেই শেষ করেছে বাবু, তাকে ঐখানে দাঁড় করাইয়া মূর্তি গড়ছিল কারিগর তার মত কইরা, সেই দুঃখে সে নাকি জলে ডুইব্যা মরে গেছে, আমার বাবার কাছে এই গপ্পই শুনছি ছোটকাল থেকে।

– তোমার বাবা তাকে দেখেছেন?

ঠোঁট উল্টায় মালী। বলে– কী জানি! তারপর মাথা নাড়ে– না বাবুজী, বাবা কোত্থেকে দেখবে, সে-তো ম্যালা দিন আগের কথা, ভিন গাঁয়ের মেয়ে ছিল সে– লোকের মুখে শোনা।

– তোমরা বাবা কোথায়? চল তার সঙ্গে কথা বলি।

– সে-তো স্বর্গে গেইছে বাবুজী।

বৃদ্ধ কবি চোখ বুজলেন।

তার পরপরই চোখ খুললেন।

থমকে দাঁড়ালেন।

– কোথায় বনমালী?

তাকালেন– হ্যাঁ, এই তো বনমালী! এর নাম কি বনমালী, না অন্য কিছু, অন্য নাম!

বাগানের ঘাস উপড়াচ্ছে সে, বনমালীকে তিনি ডেকেছিলেন, না নিজের কল্পনায়-সৃষ্ট বনমালীকে ডেকে নিজের মত করে গল্প তৈরি করেছিলেন, কী জানি! নাকি সবকিছুই এলোমেলো করে দিয়ে ঘোরের ভিতর আবিষ্ট থাকতে চাইছেন তিনি!

শাহীদা হোসেন রীনা
ছোটগল্পকার

ধা রা বা হি ক উ প ন্যা স

পাসিং শো

অমর মিত্র

আট.

ফার্স্ট ট্রাম লাস্ট ট্রাম। এ পাড়ায় একজন প্রাক্তন এমএলএ আছেন। তিনি সর্ব সাকুল্যে একবারই তা হয়েছিলেন। তারপর থেকে বিরোধী দলের লোক জিতত। সেই অতি বড় সুসময়েও তিনি জিততে পারতেন না। লম্বা চওড়া স্বাস্থ্যবান মানুষ। সত্তরের উপর বয়স, কিন্তু বেশ পোক্ত শরীর। তিনি প্রাতভ্রমণ করেন এখন একা একা। আগে সুসময়ে জনা চার তাঁকে নীরবে অনুসরণ করত। তাঁর কথায় ঘাড় হেলাত। হেঁ হেঁ করত। তখন তিনি প্রাক্তন হলেও ছিলেন ট্রাম কোম্পানির পরিচালন পর্ষদের প্রধান। লাল বাতি লাগানো গাড়িতে ভেঁপু বাজাতে বাজাতে যাওয়া আসা করতেন। এখন তাঁকে প্রায় প্রতিদিন দ্যাখে অতীন মর্নিং ওয়াকে। তিনি হাঁটছেন। খুব গম্ভীর। এককালে ক্ষমতায় ছিলেন। সেই আলো মুছে গেলেও তার ভাবটা রয়ে গেছে। দর্পিত পায়ে হাঁটেন। তাঁকে দেখে অতীনের মনে হয়, ‘আবার আসিব ফিরে’।

আবার আসিব ফিরে ব্যক্তিটিকে তাই অনেকে জোড় হাতে নমস্কার জানায় হাঁটতে হাঁটতে। তাদের কেউ কেউ চায়, হ্যাঁ, ফিরে এস অনুরাধা...।

অতীনের তাই মনে হয়। এই চাওয়ায় কোন অন্যায় নেই। মানুষ যেমন যেমন বিশ্বাস করে।

বিশ্বাস করার অধিকার সকলের আছে। মনে করে এরা খারাপ হয়ে গেছে, ভাল হয়ে ফিরবে আবার।

অতীন এখন সেই অতুলানন্দের গান ভাঁজতে ভাঁজতে প্রাতভ্রমণে বেরিয়েছে। দেখল প্রাক্তন বিধায়ক, মহাশয় সর্বজ্ঞ আসছেন। তাঁর নাম এইটি। এই নামের কারণে তাঁকে সবাই সম্ভ্রমের সঙ্গে দ্যাখে। যেন সব কিছুই জানেন। পণ্ডিতের বংশ। সংস্কৃত চর্চা করতেন ওঁর বাপ-ঠাকুরদা পূর্ব বঙ্গে। আচমকা অতীনের মনে হল, ইনিই তো খোঁজ রাখবেন। সে জোড় হাতে নমস্কার করল সর্বজ্ঞ মহাশয়কে, নমস্কার।

তখন পার্কের মস্ত মস্ত পত্রবহুল গাছের আড়াল থেকে একটি কোকিল ডাকতে আরম্ভ করল।

শাঁখ বাজাতে বাজাতে একদল এয়ো স্ত্রী জল সইতে যেতে লাগল ঝিলের দিকে। তাদের শাড়ি আর শালোয়ার কামিজে কত রং। খিলখিল হাসি শোনা যেতে লাগল। এ পাড়ার সবচেয়ে রোগা লোকটি হনহন করে আরো শীর্ণ হওয়ার বাসনায় তাদের অতিক্রম করে গেল। বনবন করে পাক খায় লোকটা।

দিনমণির লাল আভা আর একটু ফ্যাকাশে হল। সর্বজ্ঞ হকচকিয়ে গেলেন। অতীন বসু লোকটাকে তিনি ভাল চেনেন না। ভোরে লোকটা হাঁটতে বেরোয় তা দেখেছেন। তিনি হাত জোড় করলেন, হ্যাঁ, নমস্কার।

একটা জিজ্ঞাসা ছিল। অতীন বলল।

তিনি পালটা জিজ্ঞেস করলেন, আজ বিয়ের তারিখ?

মনে হয় তাই। অতীন বলল, আচ্ছা আপনি গান শোনেন?

মাথা নাড়লেন সর্বজ্ঞ, না, কেন?

কেন ভাল লাগে না? জিজ্ঞেস করল অতীন।

টাইম হয় না। বললেন সর্বজ্ঞ মশায়।

চলতে ফিরতে কিংবা অবসরে?

অবসর ছিল কোথায়? বললেন সর্বজ্ঞ।

এখন, এখন তো চাপ কমেছে? অতীন বলল।

কী জানি, চাপ বেড়েছে মনে হয়। জবাব দিলেন সর্বজ্ঞ।

মনে হয় না গান শুনি? জিজ্ঞেস করে অতীন।

গণসঙ্গীত?

অতীন বলল, হ্যাঁ, সেই ভূপেন হাজারিকা, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, শঙ্খচিলের গান?

সর্বজ্ঞ বললেন, মনে পড়ে অল্প অল্প।

দূর থেকে ভেসে আসা গান? অতীন যেন নাছোড়বান্দা।

কানে আসে, বুঝতে পারি না। বললেন সর্বজ্ঞ।

আচ্ছা কলকাতায় এখনো ফার্স্ট ট্রাম চলে? আচমকা অতীন প্রসঙ্গ বদল করে অস্বস্তি থেকে মুক্তি দেয় মহাশয় সর্বজ্ঞকে।

সর্বজ্ঞ অবাক হয়ে তাকালেন। বুঝতে পারলেন না প্রশ্নটি। এই লোকটির অদ্ভুত জিজ্ঞাসা। লোকটি কি তাকে হেনস্থা করতে এসেছে? তা যদি হয়? তিনি বিড়বিড়ে চোখে তাকালেন অতীনের দিকে। তাঁকে প্রায়ই তো শুনতে হয়, আপনারা কি আবার ফিরবেন? এই কথা। দল ছেড়ে দিচ্ছে এত মানুষ, আপনি কি দল ছাড়বেন? এখন কী ভাবে দিন কাটছে? রোজ পার্টি অফিসে যান? এতাবৎ কাল তাঁকে এমন প্রশ্ন কেউ করেনি? তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ঠিক ধরতে পারছি না, ফার্স্ট ট্রাম মানে, যে ট্রাম দিনে প্রথম ছাড়ে সেইটাই তো, ছাড়বে না কেন?

না, কলকাতার সব ট্রাম ডিপো থেকে ছাড়ত যে ফার্স্ট ট্রাম। অতীন বলল। সে নিজে কখনো মহাশয় সর্বজ্ঞর সঙ্গে কথা বলতে পারবে তা ভাবেনি। মানে কথা বলবে তা ভাবেনি। তিনি এখন একা হাঁটেন, সেইসব দেহরক্ষীরা কিংবা চেলারা সব সময়মত দলত্যাগ করেছে। কেউ গেছে রাজ্য শাসনে, কেউ গেছে রাষ্ট্র শাসনে। তাদের ভয়েই অতীন কোনদিন সর্বজ্ঞের কাছাকাছি হয়নি। সর্বজ্ঞ বললেন, আমি বুঝতে পারছি না প্রশ্নটা, ট্রাম কমে গেলেও বন্ধ তো হয়নি।

না, সেই যে ভোর সাড়ে চারটেয় ফার্স্ট ট্রাম, আর রাত বারোটায় লাস্ট ট্রাম?

ওহ হো হো, তাই তো তাই তো, সত্যি তো? মহাশয়ের মুখে অদ্ভুত হাসির জন্ম হল, আমি তো জানি না ঠিক, এখন ছাড়ে?

অতীন বলল, শুনি না তো, আমি তো শুনি না।

মহাশয় সর্বজ্ঞ বললেন, আমিও তো, মানে আমি তো চারটেয় উঠি।

তখন কী করেন? জিজ্ঞেস করল অতীন।

কী করব, কিছু না।

তখন তো আলো ফোটে না। অতীন বলল।

হ্যাঁ, শুয়ে থাকি। সর্বজ্ঞ বললেন, নানারকম চিন্তা আসে।

আপনি ওই সময়ে গান শুনতে পারেন। অতীন বলল। তার অবাক লাগছিল। একটা লোক গানই শোনে না। এমন কি থাকে না? কত লোক খবরের কাগজের বাইরে আর কিছুই পড়ে না, কতজন থিয়েটার দ্যাখে না, শুধু টিভি সিরিয়াল, কিন্তু তার মানে যে সে খুব খারাপ তা হবে কেন?

সর্বজ্ঞকে সে ভয় করত। শাসকদলের গুরুত্বপূর্ণ লোক। এখন মনে হচ্ছে ক্ষমতা চলে যাওয়া মানে ঈগলের ডানা ভেঙে দেওয়া। সেই ডানা ভাঙা পাখি তার সামনে দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞেস করছে, কী গানের কথা বলছেন?

ভোরে কি কোন গান শুনতে পান? অতীন জিজ্ঞেস করে।

গান না ফার্স্ট ট্রামের ঘড়ঘড়, ব্রিজ কাঁপিয়ে চলে যায়? সর্বজ্ঞ জিজ্ঞেস করেন।

হ্যাঁ, নেই মনে হয়। অতীন বলল, আপনি ট্রাম কোম্পানির মাথা ছিলেন তো।

হ্যাঁ, লং টেন ইয়ার্স। সর্বজ্ঞ বললেন।

তাহলে তো জানবেন?

সর্বজ্ঞ বললেন, না, জানলে তো বলতাম।

কোনদিন মনে হয়নি?

সর্বজ্ঞ বললেন, না, ট্রাম উঠিয়ে বাস চালু করার কথাই হত।

আচ্ছা, আমি যাই। অতীন বলল।

অমর মিত্র

অমর মিত্রের জন্ম ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের ৩০ আগস্ট অধুনা বাংলাদেশের সাতক্ষীরার নিকটবর্তী ধূলিহর গ্রামে। বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও পারিবারিক আবহে সাহিত্য তাঁর বিচরণক্ষেত্র হয়ে ওঠে। ২০০৬ সালে *ধ্রুবপুত্র* উপন্যাসের জন্য সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন অমর। এর আগে, *অশ্বচরিত* উপন্যাসের জন্য ২০০১ সালে পান বঙ্কিম পুরস্কার। অন্যান্য পুরস্কারের মধ্যে রয়েছে, শরৎ পুরস্কার (ভাগলপুর, ২০০৪), সর্বভারতীয় কথা পুরস্কার (১৯৯৮), গজেন্দ্রকুমার মিত্র পুরস্কার (২০১০)। বর্তমানে কলকাতা শহরে বসবাসরত অমর মিত্রের সাহিত্যিক জীবনের সূচনা ১৯৭৪ সালে। প্রথম উপন্যাস *নদীর মানুষ* ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত হয় অমৃত পত্রিকায়।

হারিয়ে একটি গান *পাসিং শো*-র কেন্দ্রবিন্দু। এই উপন্যাস একটি হারিয়ে যাওয়া গান আর হারিয়ে যাওয়া রেকর্ড নিয়ে। মানুষ তার জীবনে যা হারায় তাই বুঝি ফিরিয়ে আনতে চায় এইভাবে। একটি গান রেকর্ড করে যে গায়ক মুছে গেছেন স্মৃতি থেকে, সেই গান বুঝি ফিরে আসে গভীর রাতে, বাতাসে ভেসে কিংবা স্বপ্নের ভিতরে। আশ্চর্য এই কাহিনি যেন হারিয়ে যাওয়া জীবনেরই অন্বেষণ। আর এক অজ্ঞাতপ্রায় শিল্পীর প্রতিরোধে এই উপন্যাস পেয়েছে অনন্য এক মাত্রা। *পাসিং শো* যেন প্রবহমান জীবনের অফুরন্ত এক প্রদর্শন। *পাসিং শো* কলকাতার বিখ্যাত নাটকের দল *সায়ক* নাট্যরূপ দিয়ে অভিনয় করছে নিয়মিত।

সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত অমরের *ধ্রুবপুত্র* খরাপীড়িত প্রাচীন উজ্জয়িনী নগরের কাহিনি– কবি কালিদাসের *মেঘদূত* কাব্যের এক বিপরীত নির্মাণ যেন। দীর্ঘ এই আখ্যান শেষ পর্যন্ত শূদ্র জাতির উত্থান ও কবির প্রত্যাবর্তনে পৌঁছয়।

আর বঙ্কিম পুরস্কারপ্রাপ্ত *অশ্বচরিত* তথাগত বুদ্ধের ঘোড়া কন্থক ও তাঁর সারথী ছন্দকের কাহিনি। লেখক ভারতীয় প্রতিবেশে জাদু বাস্তবতা ব্যবহার করেছেন এই উপন্যাসে। অনন্য ক্লাসিকধর্মী এই উপন্যাস দু'টি বাংলা উপন্যাসে এক আলাদা রীতির জন্ম দিয়েছে।

না না যাবেন কেন? সর্বজ্ঞ তাকে আটকালেন।

অতীন বলে, ট্রাম উঠিয়ে দেওয়ার কথাই আলোচনা হত শুধু?

হ্যাঁ। বলে বিমর্ষ মুখে হাসলেন সর্বজ্ঞ, আসলে আমার পার্টির মত যা, আমাকে তো তাই বলতে হত, কলকাতার রাস্তায় গতি আনার দরকার ছিল।

অতীন হাঁটতে থাকে। তাকে অনুসরণ করতে থাকেন মহাশয় সর্বজ্ঞ। তিনি বলতে থাকেন, আজই আমি খোঁজ নিয়ে নেব ফার্স্ট ট্রাম, লাস্ট ট্রাম আছে কি না।

নেই, কী আবার খোঁজ নেবেন? অতীন বলে।

সর্বজ্ঞ বললেন, আগে বলেননি কেন, আমি চালু করে দিতাম আবার।

আপনার দল অনুমোদন করত না।

হু, বিমর্ষ সর্বজ্ঞ বললেন, ফার্স্ট ট্রামে আমার বাবা গঙ্গাস্নানে যেতেন।

আচ্ছা, মনে আছে আপনার? জিজ্ঞেস করল অতীন।

হ্যাঁ, চিৎপুরের ট্রাম, শোভাবাজার নেমে আমরা হেঁটে যেতাম। বিনবিন করে বলেন মহাশয় সর্বজ্ঞ।

আপনি যেতেন?

সর্বজ্ঞ বলেন, বাবার সঙ্গে কতবার গেছি, সকালের আলো ফুটতে দেখেছি।

তাই, সূর্যোদয়?

উঁহু, গঙ্গার ওপার তো পশ্চিম, কিন্তু জলের উপর আমাদের পেছন থেকে এসে আলো ছড়িয়ে পড়ত মশায়, ভুলেই গেছিলাম, ভোরের গঙ্গার ঘাটের উপর কোমর জলে দাঁড়িয়ে কলকাতার দিকে মুখ করে বাবা জোড় হাতে ওং জবা কুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ম মহাদ্যুতিম্ উচ্চারণ করতেন।

সেই ট্রাম তুলে দিলেন? অতীন ক্ষুব্ধ স্বরে বলল।

আমি তো তুলিনি। বললেন সর্বজ্ঞ।

অতীন বলল, ঠিক আছে দেখা হবে।

আরে শুনুন না, তখন গঙ্গার ধারে কী সুন্দর করতাল আর খোল বাজাতে বাজাতে একদল যেত, তারা স্নান করে আবার খোল করতাল বাজাতে বাজাতে চলে আসত, তারা ওই ফার্স্ট ট্রামেই খোল বাজাতে বাজাতে উঠত। বললেন মহাশয় সর্বজ্ঞ, বোধহয়, থাকত তারা ট্রাম ডিপোর ওপারে কৃষ্ণ মল্লিক লেনে।

সেই কলকাতা চলে গেছে। বলল অতীন।

হ্যাঁ, কিন্তু চলে গেছে মানে?

আছে সেই শহর? অতীন বলল।

ট্রাম নেই বলে শহর থাকবে না?

না থাকবে না। বলল অতীন, ওই সব যাওয়া নিয়ে কোন মাথা ব্যথা ছিল না আছে ট্রাম কোম্পানির?

চুপ করে থাকলেন সর্বজ্ঞ। তিনি এখানকার বাসিন্দা হলেও এখানকার এমএলএ ছিলেন না।

তাঁর এলাকা ছিল কলকাতার ধারেই অন্য কনস্টিটুয়েন্সি। কলকাতার ফার্স্ট আর লাস্ট ট্রাম বন্ধ হয়ে গেলে তাঁর কী? তাই মিটিঙে বসে ডিপোর জমি আর ট্রাম তুলে দেওয়া নিয়ে আলোচনা করতেন।

অতীন তাঁকে বলল, আপনি কি এই গানটা তখন শুনেছেন মহাশয় বাবু।

মহাশয় সর্বজ্ঞ বললেন, কোন গান, আমি তো বললাম গানের ব্যাপারে আমার তেমন জ্ঞান নেই, সময় পাইনি সারাজীবন।

অতীন তখন অতুলানন্দের গানটি গুনগুন করে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে উলুধ্বনি শোনা গেল। জল সইয়ে ফিরছে পুর নারীরা। ওমা, ওরা যে গান ও গাইছে। কী গান কী গান, কোরাসে তারা গাইছে, বলি ও ননদি আর দু'মুঠো চাল ফেলে দে হাড়িতে, ঠাকুরজামাই এল বাড়িতে। তার ভিতরে অতুলানন্দ ভেসে গেল। সর্বজ্ঞ আর অতীন শুনতে লাগল মুগ্ধ হয়ে। ওই ওদের ভিতরে একজন পাকা গাইয়ে আছেন। তিনি গাইছেন, আর অন্যরা গলা মেলাচ্ছে। ঠাকুরজামাই এল বাড়িতে। সেই কতকাল আগে বন্যার বছরে, ১৯৭৮ সালে এই গান গেয়েছিল স্বপ্না চক্রবর্তী, বীরভূমের মেয়ে।

কতদিন বাদে সেই গান গাইতে গাইতে তাদের অতিক্রম করতে লাগল লাল সবুজ নীল হলুদ খয়েরি বেগনি রঙের অনেক নারী, আঁচল কিংবা ওড়না বাতাসে উড়িয়ে। উলুধ্বনি দিতে দিতে, উল্লাস জাগাতে জাগাতে।

নয়.

অনীশ, অনি জিজ্ঞেস করল, তোমার সমস্যা মিটল বাবা?

চায়ের টেবিলে এক একদিন দেখা হয়ে যায় অনির সঙ্গে। সে রাত জাগে। ঘুমোয় সেই রাত চারটে নাগাদ। অতীন যখন অফিসে বের হয়, অনি তখন ঘুমের ভিতরে। গত রাতে তাড়াতাড়ি শুয়েছিল হয় তো। অতীন জিজ্ঞেস করল, কোন সমস্যা?

অতুলানন্দের সেই নদীর গান। বলে মুচকি হাসে অনি।

মাথা নাড়ে অতীন, বলল, কত ইমপরট্যান্ট লোক আছে, বড় বড় কাজ করে বেড়ায়, সারাজীবন বিপ্লবের কথা ভেবে গানই শোনা হয়নি, টাইম পাননি।

অনি অবাক হল না, বলল, এমন আমিও দেখেছি।

তুই, কোথায় দেখলিরে?

অনি বলল, হি লিভস ইন লালমনিরহাট, তাঁর নাম হুকুমচাঁদ রায়।

লালমনিরহাট, সে কোথায়? শম্পা জিজ্ঞেস করে।

অনি বলল, বাংলাদেশ, সাবেক জেলা রংপুর।

তার সঙ্গে কী করে আলাপ হল? অতীন জিজ্ঞেস করে।

ফেসবুক, কিন্তু লোকটা এখন শুনতে চায়, আমার কাছে জানতে চাইছে কোন গান শুনলে তার মন ভাল হয়ে যাবে। বলল অনি।

তার মন কিসে ভাল হয়ে যাবে, তুই বলে দিবি?

অনি বলল, হুকুমচাঁদ লোকটা ভাল, সংখ্যালঘু উন্নয়ন সমিতি করে, সারাজীবন গেছে শুধু টিকে থাকতেই, দেশটা তার এই কথা দশজনকে বোঝাতে বোঝাতে।

তুই কী বললি? শম্পা জিজ্ঞেস করে।

আমি বলেছি, আগে একটা যন্ত্র কিনতে গান শোনার, তারপর বলা যাবে।

কী বলবি তুই? শম্পা জিজ্ঞেস করে।

আমি কী বলব, লোকটা মেসিন কিনে তো ফেলে রাখবে না, সিডিও কিনবে ঠিক, সিলেক্ট করে ফেলবে নিজে নিজেই, ও শুধু জানে বাউল কবি বিজয় সরকার, লালনের গোয়ালপাড়ার গান, ভাওয়াইয়া।

তাহলে তো অনেক জানে রে। শম্পা বলল।

হ্যাঁ, আরো জানতে চাইছে, শুনতে চাইছে। অনি বলে।

অতীন তখন বলল মহাশয় সর্বজ্ঞর কথা। হুকুমচাঁদ রায় তো শোনে, জানে, যা শুনেছে তা নিয়েই সাতজীবন কাটিয়ে দেওয়া যায়। আরো শুনতে চাইছে, কিন্তু মহাশয় তো একবারও বললেন না, কিছু শুনেছেন কি না। বললেন না তো শুনবেন গান। জীবন কাটিয়েছেন অন্যের দেওয়া চাঁদা আর ট্যাক্সের টাকায়। মহাসুখে। মহাসুখ মানে পরের পয়সায় যথেচ্ছ সুখ। ট্রাম প্রায় উঠেই গেছে শহর থেকে। ফার্স্ট ট্রাম লাস্ট ট্রাম আছে কি না সে খবর রাখেন না তিনি। সারাজীবন এত আয়েস করতে গিয়ে গান শোনার সময় পাননি। আর হুকুমচাঁদ রায় লালমনিরহাট সংখ্যালঘু উন্নয়ন সমিতি করতে গিয়ে মার খেয়েছে, জেল খেটেছে, এখনো তাই করে যাচ্ছে। তার ঘরের চালে কতবার যে আগুন লেগেছে। অন্য সংখ্যালঘুর গ্রাম কতবার যে পুড়েছে, এইসব নিয়েই জীবন কেটেছে তার। এখনো কাটছে। সর্বজ্ঞ তার বিপরীত। এখন দিশেহারা হয়ে একা একা কী করবে তা বুঝে উঠতে পারছে না।

অনি বলল, আমি ফেসবুকে লিখে দিয়েছি বাবা, কেউ অতুলানন্দের রেকর্ড রেখেছে কি না জমিয়ে।

তারপর? শম্পা জিজ্ঞেস করল।

দেখা যাক কী হয়, কেউ কেউ তো বলছে শুনেছে যেন।

বলছে! জিজ্ঞেস করে অতীন।

ও কিছু না, হয়তো কোনদিনই শোনেনি, কিন্তু কমেন্ট তো করতে হয়।

অতীন বলল, মিথ্যে বলবে?

মিথ্যেই তো বলে বাবা, শুনেছে যেন মানে কী, প্রচুর লোক লাইক করছে। বলতে বলতে নীল উঠল, তুমি একটা কাজ করতে পার, তুমি ধর্মতলায় যেতে পার, ওয়েলিংটন স্কোয়ারে, ওখানে পুরনো রেকর্ড বিক্রি

হয়, ওরা অনেক জানে।

তাই তো! অতীন বলল, এটা মনে পড়েনি তো, আমি তো এক সময়ে ওখানে রেকর্ড খুঁজতাম, সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে যেতে হত অফিসের কাজে, ফেরার সময় ওয়েলিংটনের মোড়, তখন ঘুরে ঘুরে রেকর্ড দেখা। তার মনে পড়েনি, কিন্তু নীলের মনে এল কী কী করে? নীল কি ওখানে যায় রেকর্ড দেখতে? ওখানে তো হারিয়ে যাওয়া গায়ক-গায়িকার কণ্ঠস্বর ধরা আছে নানা মাপের রেকর্ডে।

অনি বলল, না বাবা, আমি বাস থেকে দেখেছি, আমার ফেসবুক ফ্রেন্ড বিমল বিশ্বাস বলল কাল রাতে।

কী নাম? শম্পার দুচোখে প্রবল বিস্ময়, কী নাম বললি?

অনি আবার বলল, বিমল বিশ্বাস ফ্রম ডুমুরিয়া।

অবাক অবাক! অতীনও গভীর বিস্ময়ের ভিতরে ডুবে যাচ্ছিল। বিমলের পৈতৃক বাড়ি তো ডুমুরিয়ায়। ডুমুরে। জেলা খুলনা। তাই যেন বলেছিল। সে তো গত পরশু এসেছিল এই বাড়ি। ডুমুরে কী করে হল? তাহলে? শম্পা বলল, তাই হয় নাকি?

কেন? জিজ্ঞেস করল অনি।

শম্পা তখন বিমল বিশ্বাসের কথা বলল। তার কথায় অতীন জুড়ল কথা, ওদের বাড়িও ডুমুরিয়া ছিল, কিন্তু ও কী করে ফেসবুকে যাবে?

শম্পা জিজ্ঞেস করে, প্রোফাইল পিকচার আছে?

না মা, সেখানে একটি রস কাটে যে শিউলি, তার ছবি।

কবে সে তোর বন্ধু হল? জিজ্ঞেস করল শম্পা।

তা তো মনে নেই, কিন্তু তার সঙ্গে আগে কখনো কথা হয়নি। বলে অনি, গতকাল সে প্রথম আমার স্টাটাসে কমেন্ট করে।

অতীন বলল, ফেক আইডি হবে, বাংলাদেশের লোক কী করে ওয়েলিংটনের কথা বলে, অ্যাবসারড, কলকাতার কোথায় পুরনো রেকর্ড পাওয়া যায়, তা সে কী করে জানবে, ইজ ইট পসিবল?

অনি বলল, তুমি ঠিক বলছ বাবা, অ্যান্ড আই আস্কড হিম, সে বলল, সে একবারই কলকাতা এসেছিল, তখন তার সোনারপুরের ভাইপো তাকে ওখানে নিয়ে গিয়েছিল পুরোন রেকর্ডের খোঁজে, সে খুঁজছিল সুধীরলাল চক্রবর্তীর পৃথিবী আমারে চায় গানটির রেকর্ড, রেকর্ডই দরকার ছিল তার, সে রেকর্ডে শুনবে, আরো অনেক রেয়ার গান পেয়েছিল সে সুধীরলালের সঙ্গে।

সত্যি?

হ্যাঁ বাবা, সে বলল, রেকর্ড বেচিয়ে লোকটার নাম গোলাম হোসেইন, খিদিরপুরে বাড়ি।

খিদিরপুর, তাও জানে?

হ্যাঁ বাবা, হি গেভ মি দ্য ডিটেইলস অফ দ্য ম্যান, মি. বিশ্বাস বললেন, তিনি বোধহয় শুনেছিলেন গানটি।

অতুলানন্দর গান?

হ্যাঁ। অনি বলল।

তারপর? শম্পা জিজ্ঞেস করল।

অনি বলল, আর কথা হয়নি মা, অফ লাইন হয়ে গেলেন তিনি।

অতীনের মনে হল, কেন মনে হল তা সে বলতে পারবে না, বিমলের সঙ্গে একবার কথা বলা দরকার। আজ তো বাজার করেই ফিরেছে সে একটু আগে। বিমল এসেছে কি আসেনি, তা সে দ্যাখেনি। ওই দিকে যায়নি। তাহলে আগামীকাল। কাল একবার জিজ্ঞেস করে দেখবে, ডুমুরিয়াতে তার নামে কি কেউ আছে? কথাটা ভাবতেই অতীন নিজেই হেসে ফেলল, তা কী করে হবে? বিমলের যখন চার বছর, তখন তারা এপারে চলে আসে। সে এর কিছুই জানে না। কোন খোঁজই রাখে না সেই দেশের।

তবু অতীন পরদিন বিমলের কাছেই গেল। দেখল সে নিমগাছের গোড়ায় অন্য একজন বসে আছে। বিমল আসেনি। সে জিজ্ঞেস করল, এখানে যে বসে, সে কোথায়?

আসেনি তো। সেই বুড়ো বলল। সে পাতিলেবু, লঙ্কা, ধনেপাতা, রসুনপাতা এইসব নিয়ে বসে আছে। অতীন জিজ্ঞেস করল, গতকাল এসেছিল?

না বাবু, তিনদিন ধরে আসছে না।

আচ্ছা, তার বাড়ি কোথায়?

বুড়ো মাথা নাড়ে। অতীন হতাশ হয়ে ফেরার সময় দ্যাখে সেই যে বিশিষ্ট ব্যক্তি, সুজন সাহা ডিমওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া লাগিয়েছে, আব্বে, পাঁচটার ভিতরে দুটো পচা, তোর বাপের টাকা শুয়ার, দে, টাকা ফেরত দে।

আমি তো বলেছি স্যার, পচা ডিমগুলো নিয়ে আসতে। মিনমিন করে বলে ডিমওয়ালা, দেখতে হত, আর কেউ তো কমপ্লেন করছে না।

আরে বাঞ্চোত, আমি পচা ডিম নিয়ে আসব হাতে করে, শালা হাজতে ঢুকিয়ে দেব, তুমি আমাকে চেন না, গাঁড়ে ঢুকিয়ে দেব আছোলা।

থরথর করে কাঁপছে ডিমওয়ালা তরুণ। সে চেনে সাহাকে। সরে এল অতীন। সরে এসে টের পেল, সে একটা সুযোগ সন্ধানী, ভীরু ব্যক্তি। তার সাহস নেই সুজন সাহাকে বলা, ও ভাবে কথা বলতে নেই। সে উত্তেজিত হয়েছে মনে মনে, তা সত্য, কিন্তু তারপর এর কিছু করতে পারছে না।

সুজন লোকটা ভাল না। তাকেও হয়তো ওই ভাষায় খিস্তি করবে। সে কোন বিরোধিতা সহ্য করে না। তার টাকা আছে অঢেল, সুতরাং সহ্য করবে কেন? তার কথায় সাতটা পোষা মাস্তান এখনই এসে যেতে পারে। অতীন মন খারাপ করে বাজার থেকে ফিরল। না, বিমলের দেখা যেমন পায়নি, সুজনের গরমবাজি শুনে এসেছে। অতীন পরপর ক'দিন বিমলের দেখা পায় না। বাজারে বসা ছেড়েই দিল।

নতুন পাঞ্জাবি পরে কি এই এতকাল বাদে ফিরে গেল ডুমুরিয়া? সেখানে গিয়ে ফেসবুক খুলে বসেছে।

তা হয় নাকি? সে বিমলের দেখা পায় পরের রোববারে। সেদিন দুপুর থেকে আকাশ কালো হয়ে গিয়েছিল। এত ঘন করে মেঘ উঠল যে তার মনে পড়ে গেল টালা পার্কের এক প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের দুপুর। কালো মেঘের নিচে বকের সারি উড়াল দিয়েছে। কাল বৈশাখী। ঘোর কালো মেঘ যেন সাজিলরে। ঝড় উঠবে উঠবে করে সময় নিল অনেক। তাদের ফ্ল্যাটের পেছনে জৈন মন্দিরের পাম ট্রি, শিরিস গাছের পাতা নড়ছে না। মনে হতে লাগল বড় এক আঘাতের জন্য অপেক্ষা করছে গাছগুলি।

মধ্যদিনেই রাত নেমে এল। অনি বলল, আসছে, সে আসছে, একটু আগে মেদিনিপুরের দাঁতনে ঘূর্ণিঝড়ে একটা গ্রামের পঞ্চাশটা বাড়ির চাল উড়ে গেছে, গরু বাছুর মরেছে আছাড় খেয়ে।

কে বলল তোকে?

ফেসবুকে ছবি এসে গেছে বাবা, ম্যাসিভ ডিজাস্টার। অনি বলল।

শম্পা বলল, জানলা বন্ধ কর, হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়বে মেঘ।

অত কালো আর ঘন মেঘ ভেঙে পড়বে! কী ভয়ানক না হবে তা। একবার খণ্ড মেঘ ভেঙে পড়ে মুম্বই শহর ভাসিয়ে দিয়েছিল প্রবল বৃষ্টিতে। তেমনি হবে নাকি? তেমন কি আর হয়? গতকালই টেলিভিশনে দেখছিল তাইওয়ানে সন্ধের মুখে প্রবল ঝড় আর বৃষ্টি। দামী বিএমডবিউ গাড়ি ওলটপালোট খাচ্ছে রাস্তার উপরে। সব যেন খেলনা। প্রকৃতির শক্তির কাছে সব তুচ্ছ। আমেরিকার সমুদ্রোপকূলে ঝড়-ঝঞ্ঝা তো তো লেগেই আছে। অতীন শেষ বড় ঝড় দেখেছে আয়লা। তার আগে একবার ঝড় ঘুরে গিয়ে ওড়িশার উপকূল অঞ্চল শেষ করে দিয়েছিল। বাতাস উঠতে আরম্ভ করেছে।

দূরে কোথায় মানুষের গলার স্বর শোনা যাচ্ছে। ঝড়ের সময় বাইরে থাকা মানুষকে ডাকছে তার কেউ।

ছেলেকে মা হতে পারে। গাঁয়ে হলে গরুর দড়ি খুলে দিত গেরস্ত। গোয়াল চাপা পড়ে মরার চেয়ে নিজে আত্মরক্ষা করে বাঁচার চেষ্টা করতে দোষ কী? শম্পা পরপর জানালা টেনে ছিটকানি দিতে লাগল।

বাইরের বাতাস ঘা মারতে লাগল দরজা-জানলায়। বাতাস বাড়ছে একটু একটু করে। ছিটকিনিতে আঁটা জানলা যেন কেউ নাড়াতে লাগল বাইরে থেকে। বন্ধ দরজাও নড়ছে। কেউ যেন এসেছে বাইরে।

ভীষণ ঝড় এল।

• পরবর্তী সংখ্যায়

অমর মিত্র
সাহিত্য একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত ভারতীয় লেখক

সৌহার্দ

ভারতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

ভারত সরকার প্রত্যেক বছরে ভারতীয় কারিগরি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা (ইন্ডিয়া টেকনিক্যাল এন্ড ইকোনমিক কো-অপারেশন-আইটিইসি) কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রস্তাব দিচ্ছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ৫০টি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে এসব স্বল্পমেয়াদী কোর্সের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের বিষয় যেমন– একাউন্টিং, টেলিযোগাযোগ, ইংরেজি, ব্যবস্থাপনা, গ্রামোন্নয়ন ও অন্যান্য বিশেষায়িত কারিগরি কোর্স। ভারত সরকার ৩-৬ মাসের সংক্ষিপ্ত ও মাঝারি মেয়াদি এসব কোর্সের ব্যয়ভার বহন করে।

যোগ্যতা

আবেদনকারীর বয়স ২৫-৪৫ বছরের মধ্যে হবে এবং সরকারি-বেসরকারি বিশেষায়িত কোর্সের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সরকারি প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, স্বনামধন্য কর্পোরেট হাউস বা বাণিজ্যিক সংস্থায় কর্মরত ব্যক্তিবর্গ এ কোর্সে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন। ইংরেজির ব্যবহারিক জ্ঞান অত্যাবশ্যক।

কিভাবে আবেদন করবেন

আইটিইসি-র যে-কোন কোর্সে আবেদন করতে হলে আবেদনকারীকে আইটিইসি-র https://itecgoi.in পোর্টালে গিয়ে নিজস্ব লগইন ও পাসওয়ার্ড তৈরি করে নিজেদের নাম রেজিস্টার করতে হবে। তারপর অনলাইনে মনোনীত কোর্সে আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার পর আবেদনকারী ফরম ডাউনলোড করে আবেদনপত্রটি হাইকমিশন অফ ইন্ডিয়া, ঢাকা-য় ফরওয়ার্ড করবেন।

সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিকে অর্থমন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ বা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুপারিশসহ আবেদনপত্র পাঠাতে হবে। কোর্সের বিস্তারিত বিবরণ এবং আবেদনপত্র নিম্নলিখিত লিঙ্ক থেকে পাওয়া যাবে:- http://itec.mea.gov.in লিঙ্কগুলো ভারতীয় হাই কমিশনের ওয়েবসাইট www.hcidhaka.gov.in-এর Education & Training সেকশনেও পাওয়া যাচ্ছে। যে কোন তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন: fshoc@hcidhaka.gov.in এবং commerce@hcidhaka.gov.in

Training Programme in India

The Government of India offers the training courses under the India Technical and Economic Cooperation (ITEC) programme every year. The courses include diverse subjects such as Accounting, Telecommunication, English, Management, Rural Development and other specialized technical courses in over 50 reputed Institutions across India. These are short and medium term courses of between 3-6 months duration and are completely sponsored by the Government of India.

Eligibility

The applicants must be between 25-45 years of age and should have 5 yearsÕ relevant work experience in the area of specialized course in either Government or in a private organisation. They may belong to Government, Universities, reputed corporate houses or trade bodies. Working knowledge of English is essential.

How to apply

To apply for any ITEC course, the applicant must visit ITEC portal at https://itecgoi.in and register himself/herself by creating their own login and password. Thereafter, apply for the selected course online. After submitting the application form, the selected course online. After submitting the application form, the applicant should download the form and forward the application to the High Commission of India, Dhaka along with a letter of recommendation from the parent organisation of the applicant. Applicants working in the Government must approach the Economic Relations Division (ERD), Ministry of Finance or the Ministry of Foreign Affairs of the Government of Bangladesh for recommending the applications.

The details of courses on offer for the year and application forms can be downloaded at the following links :-

http://itec.mea.gov.in

The links are also available at the website of the High Commission of India at www.hcidhaka.gov.in under the Education & Training section.

Any queries may be addressed to fshoc@hcidhaka.gov.in & commerce@hcidhaka.gov.in

Coca-Cola
খোলো খুশির জোয়ার!

রাজ্য পরিচিতি

ত্রিপুরা

ত্রিপুরা উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি রাজ্য। এই রাজ্যের আয়তন ১০,৪৯১.৬৯ বর্গকিলোমিটার এবং এটি ভারতের তৃতীয় ক্ষুদ্রতম রাজ্য। ত্রিপুরা উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমে বাংলাদেশ পরিবেষ্টিত; রাজ্যের পূর্বভাগে ভারতের অপর দুই রাজ্য অসম ও মিজোরাম অবস্থিত। এই রাজ্যের রাজধানী আগরতলা। রাজ্যের সরকারি ভাষা বাংলা ও ককবরক। পূর্বে ত্রিপুরা ছিল একটি স্বাধীন করদ রাজ্য। ১৯৪৯ সালের ১৫ অক্টোবর ত্রিপুরা অন্তর্ভুক্তি চুক্তি অনুসারে এই রাজ্য ভারতীয় অধিরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। উল্লেখ্য, ব্রিটিশ শাসনকালে এই রাজ্য পার্বত্য ত্রিপুরা (Hill Tippera) নামে পরিচিতি ছিল।

নামের বুৎপত্তি

- ত্রিপুরা নামটির উদ্ভব হয় ত্রিপুরার পৌরাণিক রাজা ত্রিপুরের নামানুসারে। ত্রিপুর ছিলেন যযাতির বংশধর দ্রুহ্যর ৩৯তম উত্তরপুরুষ।
- অপর এক ব্যাখ্যা অনুসারে ত্রিপুরা নামটির উৎস হল হিন্দু পুরাণে উল্লিখিত দশমহাবিদ্যার একতম ত্রিপুরাসুন্দরী।

তাছাড়া ত্রিপুরা শব্দটির উৎপত্তি রাজ্যের আদিবাসীদের অন্যতম ভাষা ককবরক থেকেও এসেছে বলে অনেকে মনে করেন। ককবরক ভাষায় তৈ হল জল। প্রা হল

এক নজরে ত্রিপুরা

রাজধানী	আগরতলা
বৃহত্তম শহর	আগরতলা
দেশ	ভারত
অঞ্চল	উত্তর-পূর্ব ভারত
জেলা	৮টি
প্রতিষ্ঠা	২১ জানুয়ারি, ১৯৭২
বিধানসভা	৬০
সরকার	
• রাজ্যপাল	তথাগত রায়
• মুখ্যমন্ত্রী	মানিক সরকার
আয়তন	
• মোট	৪০৫০.৮৬ বর্গমাইল (১০৪৯১.৬৯ কিমি)
জনসংখ্যা (২০০১)	
• মোট	৩১,৯৯,২০৩
• ঘনত্ব	৭৯০/বর্গমাইল (৩০৫/কিমি)
সময় অঞ্চল	ভারতীয় সময় (ইউটিসি+৫.৩০)
PIN	৭৯৯ xxx
সরকারি ভাষা	বাংলা, ককবরক
ওয়েবসাইট	ত্রিপুরা সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক ওয়েবসাইট

তথাগত রায়

মানিক সরকার

নিকটে। জলের নিকটবর্তী স্থান তৈ-প্রা থেকে ধীরে ধীরে তেপ্রা, তিপ্রা এবং শেষে বাঙালি উচ্চারণে ত্রিপুরা হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

ইতিহাস

সুপ্রাচীন মহাকাব্য মহাভারতে এবং পুরাণে ত্রিপুরা নামটির উল্লেখ পাওয়া যায়। এরপর চতুর্দশ শতকে রচিত রাজমালাতেও ত্রিপুরার উল্লেখ পাওয়া গেছে। এটি ছিল ত্রিপুরার মাণিক্য রাজবংশের কাহিনি। মাণিক্য রাজবংশ ১৯৪৭ সালে ত্রিপুরা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পূর্বাবধি অঞ্চলটি ধারাবাহিকভাবে শাসন করেন। কথিত আছে প্রায় ২৫০০ বছর ধরে ১৮৬জন রাজা এই অঞ্চলটি শাসন করেছেন। ভারতে ব্রিটিশ শাসনকালে ত্রিপুরা ছিল একটি স্বাধীন করদ রাজ্য। দক্ষিণ ত্রিপুরায় অবস্থিত উদয়পুর ছিল ভূতপূর্ব স্বাধীন রাজতান্ত্রিক ত্রিপুরার রাজধানী। খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতকে মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য পুরাতন আগরতলায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন এবং পরবর্তীকালে খ্রিস্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাজধানী অধুনা আগরতলায় স্থানান্তরিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীকে ত্রিপুরার আধুনিক যুগের সূচনা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে কারণ এই সময় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর দেববর্মা ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার অনুকরণে তাঁর প্রশাসনকে পুনর্গঠিত করেন এবং বিভিন্ন সংস্কার সাধন করেন।

১৯৪৯ সালে গণমুক্তি আন্দোলনের ফলে ত্রিপুরা অসম রাজ্যের অংশ হিসেবে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাজনের ফলে ত্রিপুরার জনপরিসংখ্যান ভীষণভাবে পরিবর্তিত হয় এবং তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত বাঙালি শরণার্থীরাই ত্রিপুরার জনসংখ্যার গরিষ্ঠ অংশ হয়ে ওঠে। ১৯৬৩ সালের ১ জানুয়ারি ত্রিপুরা একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে রূপান্তরিত হয় এবং ১৯৭২ সালের ২১ জানুয়ারি একটি পূর্ণাঙ্গ রাজ্য হিসেবে স্বীকৃত হয়।

ভূগোল ও জলবায়ু

ত্রিপুরা হল উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি ভূ-বেষ্টিত পার্বত্য রাজ্য। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা ১৫ থেকে ৯৪০ মিটার। এতদ্‌সত্ত্বেও ত্রিপুরার অধিকাংশ মানুষ সমতলে বসবাস করেন। এটি একটি ভূ-বেষ্টিত রাজ্য হওয়া সত্ত্বেও এটি মানু নদীর মত বিভিন্ন নদীর উৎসভূমি। ত্রিপুরা উত্তরে, দক্ষিণে ও পশ্চিমে বাংলাদেশ দ্বারা বেষ্টিত এবং অসমের করিমগঞ্জ জেলা ও মিজোরামের আইজল জেলার দ্বারা এটি ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। ত্রিপুরা রাজ্যটি অক্ষাংশ ২২°৫৬উঃ থেকে ২৪°৩২উঃ এবং দ্রাঘিমাংশ ৯০°০৯পূঃ থেকে ৯২°১০পূঃ পর্যন্ত বিস্তৃত।

অর্থনীতি

২০০৪ সালে ত্রিপুরার মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন নির্ধারিত হয়েছে বর্তমান মূল্যে ২১০ কোটি মার্কিন ডলার। ত্রিপুরার অধিকাংশ মানুষই কৃষিজীবী এবং ত্রিপুরার জনসংখ্যার ৬৪ শতাংশই কৃষির সঙ্গে যুক্ত। পণ্যফসলের তুলনায় ত্রিপুরায় খাদ্যফসল উৎপাদনের পরিমাণই অধিক। ত্রিপুরায় উৎপন্ন প্রধান খাদ্যফসলগুলি হল ধান, তৈলবীজ, ডাল, আলু এবং আখ। চা ও রাবার হল রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পণ্যফসল। ত্রিপুরা হল 'ভারতীয় রাবার বোর্ড' ঘোষিত দেশের দ্বিতীয় রাবার রাজধানী এবং এর স্থান কেরলের পরেই। ত্রিপুরার হস্তশিল্পও অত্যন্ত বিখ্যাত। ২০০০-'০১ আর্থিক বছরে এ রাজ্যের মাথাপিছু আয় বর্তমান মূল্যে হল ১০,৯৩১ টাকা এবং স্থায়ী মূল্যে হল ৬,৮১৩ টাকা।

শাল, গর্জন এবং টিকসহ কিছু উৎকৃষ্ট মানের কাঠ ত্রিপুরার বনাঞ্চলে পাওয়া যায়। এছাড়া ত্রিপুরা খনিজ সম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ না হলেও এখানে ভাল প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপন্ন হয়। তবে শিল্পক্ষেত্রে ত্রিপুরা এখনও অনগ্রসর।

সরকার ও রাজনীতি

ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মতই ত্রিপুরাতেও সংসদীয় প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকার পরিচালিত হয়। সরকার ব্যবস্থা তিনটি শাখায় বিভক্ত যথা, আইনসভা, বিচারবিভাগ এবং প্রশাসন। ত্রিপুরার আইনসভা হল নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত ত্রিপুরা বিধানসভা। বিধানসভার অধ্যক্ষ এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে উপাধ্যক্ষ সভার কার্যাবলিতে পৌরোহিত্য করে থাকেন। ত্রিপুরার বিচারবিভাগের প্রধান হল গুয়াহাটি উচ্চন্যায়ালয় (আগরতলা বেঞ্চ)। এছাড়াও বিভিন্ন নিম্ন আদালতের দ্বারা বিচারব্যবস্থা পরিচালিত হয়। ত্রিপুরা রাজ্যে প্রশাসনের সাংবিধানিক প্রধান হলেন রাষ্ট্রপতির মনোনীত রাজ্যপাল। কিন্তু মূল প্রশাসনিক ভার মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভার উপরে ন্যস্ত। বিধানসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রাপ্ত রাজনৈতিক দল অথবা রাজনৈতিক জোটের নেতা অথবা নেত্রীকে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী পদের জন্য আহ্বান জানান। এরপর রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শে মন্ত্রিসভার সদস্যদের মনোনীত করেন। মন্ত্রিসভার সদস্যারা তাঁদের কার্যাবলির বিবরণ বিধানসভায় পেশ করে থাকেন। ত্রিপুরা বিধানসভা হল ৬০ সদস্য বিশিষ্ট একটি এককক্ষীয় আইনসভা। একটি নির্বাচিত বিধানসভার পূর্ণ মেয়াদ হল পাঁচ বছর কিন্তু সরকার নির্ধারিত মেয়াদের আগেই বিধানসভা ভেঙে দিয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে পারেন। ত্রিপুরা থেকে লোকসভায় দু'জন সদস্য এবং রাজ্যসভায় একজন সদস্য নির্বাচিত হন। এছাড়াও গ্রামীণ পরিচালন সংস্থা পঞ্চায়েতে নিয়মিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

ত্রিপুরার প্রধান রাজনৈতিক জোট ও দলগুলি হল বামফ্রন্ট এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। বর্তমানে ত্রিপুরা সরকারে ক্ষমতাসীন রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট। ১৯৭৭ সালের পূর্বাবধি ত্রিপুরায় ক্ষমতাসীন ছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। ১৯৭৭ থেকে ১৯৮৮

ত্রিপুরা সরকার পরিচালিত হয় বামফ্রন্টের নেতৃত্বাধীনে এবং ১৯৯৩ সাল থেকে আবার তারা ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন করে। ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৩ পর্যন্ত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির জোট সরকার পরিচালনা করে। ২০০৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ত্রিপুরার সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে ৬০টি আসনের ৪৯টিতে জয়লাভ করে বামফ্রন্ট ক্ষমতাসীন হয় এবং এর মধ্যে ৪৬ আসন ছিল সিপিআই(এম)-এর।

প্রশাসনিক বিভাগসমূহ

প্রশাসনিক স্বার্থে ত্রিপুরাকে ৮টি জেলা ২৩টি মহকুমা (উপবিভাগ) এবং ৫৮টি উন্নয়ন ব্লকে বিভক্ত করা হয়েছে।

জেলা	জেলাসদর	জনসংখ্যা	আয়তন (বর্গ কিমি)
ধলাই জেলা	আম্বাসা	৩০৭৪১৭	২৩১২
উত্তর ত্রিপুরা	কৈলাসহর	৫৯০৬৫৫	২৪৭০
দক্ষিণ ত্রিপুরা	উদয়পুর	৭৬২৫৬৫	২৬২৪
পশ্চিম ত্রিপুরা	আগরতলা	১৫৩০৫৩১	৩৫৪৪
ঊনকোটি			
খোয়াই			
গোমতী			
সিপাহীজলা			

রাজ্যের প্রধান শহরগুলি হল আগরতলা, বিশালগড়, যোগেন্দ্রনগর, ধর্মনগর, সোনামুড়া, অমরপুর, প্রতাপগড়, উদয়পুর, কৈলাসহর, তেলিয়ামুড়া, ইন্দ্রনগর, খোয়াই ও বেলোনিয়া। বাঁধারঘাট, যোগেন্দ্রনগর এবং ইন্দ্রনগর বর্তমানে আগরতলা পুরসভার অন্তর্গত।

পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা

ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে ত্রিপুরা সংযুক্ত হয়েছে অসমের মধ্যে দিয়ে লুমডিং এবং শিলচর পর্যন্ত বিস্তৃত ব্রডগেজ রেলওয়ে লাইনের মাধ্যমে। ত্রিপুরার প্রধান রেল স্টেশনগুলি হল আগরতলা, ধর্মনগর এবং কুমারঘাট। এছাড়া ৪৪ জাতীয় সড়কও ত্রিপুরাকে অসমসহ সমগ্র ভারতের সঙ্গে যুক্ত হতে সাহায্য করেছে।

আগরতলা বিমানবন্দর হল এ রাজ্যের প্রধান বিমানবন্দর এবং এখান থেকে কলকাতা, গুয়াহাটি, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই, দিল্লি এবং শিলচরের উদ্দেশে নিয়মিত বিমান চলাচল করে।

ভারতের প্রধান টেলিযোগাযোগ সংস্থাগুলির অধিকাংশই ত্রিপুরা রাজ্যে উপস্থিত এবং এগুলি রাজধানীসহ রাজ্যের অন্যান্য অংশে দূরভাষ এবং ইন্টারনেট পরিষেবা প্রদান করে।

জনপরিসংখ্যান

ত্রিপুরা হল অসমের পরেই উত্তর-পূর্ব ভারতের দ্বিতীয় জনবহুল রাজ্য। ২০০১ সালের জনগণনা অনুসারে রাজ্যের মোট জনসংখ্যা হল ৩,১৯৯,২০৩ এবং জনঘনত্ব হল প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৩০৫ জন। সারা দেশে জনসংখ্যার বিচারে ত্রিপুরার স্থান ২২তম। সমগ্র ভারতের জনসংখ্যার ০.৩১% এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জনসংখ্যার ৮.১৮% ত্রিপুরায় বসবাস করে। ২০০১ সালের জনগণনা অনুসারে ত্রিপুরার জনসংখ্যার ৭০% বাঙালি এবং বাকি ৩০% বিভিন্ন উপজাতি ও জনজাতীয় সম্প্রদায় নিয়ে গঠিত। জনজাতীয় সম্প্রদায়গুলির মধ্যে বিভিন্ন ভাষাভাষী উপজাতি রয়েছে এবং এদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হল ককবরকভাষী ত্রিপুরি সম্প্রদায়। এছাড়াও রয়েছে জামাতিয়া, রিয়াং, নোয়াতিয়া অন্যান্য সম্প্রদায়। আদিবাসী অঞ্চলগুলিতে বাঙালি ও আদিবাসীদের মধ্যে অনেক সময় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

১৯৯১ সালের সূত্র অনুযায়ী মানব উন্নয়ন সূচকে সারা দেশে ত্রিপুরার স্থান ২২তম এবং দারিদ্র সূচকে ২৪তম। ত্রিপুরায় সাক্ষরতার হার ৭৩.২%, যা সাক্ষরতার জাতীয় হার ৬৫.২০%-এর অধিক।

ত্রিপুরার সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মীয় সম্প্রদায় হল হিন্দু (মোট জনসংখ্যার ৮৫.৬%)। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মুসলিম (৮.০%), খ্রিস্টান (৩.২%) এবং বৌদ্ধ (৩.১%)।

এই পরিসংখ্যান সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরার বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুপাতের একটা পরিবর্তনের ইঙ্গিত করে। ১৯৪১ সালে ত্রিপুরার জনসংখ্যায় হিন্দু ছিল ৭০%, মুসলিম ছিল ২৩% এবং ৬% ছিল বিভিন্ন উপজাতি ধর্মাবলম্বী। এটিও বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে ১৯৫১ সালে ত্রিপুরার জনসংখ্যা ছিল ৬৪৯৯৩০, যা ১৯৪১ সালে ছিল আরও স্বল্প কারণ তখনও পূর্ববঙ্গ থেকে শতাধিক শরণার্থীর আগমন ঘটেনি। যদিও এই শরণার্থীর আগমনও ত্রিপুরার জনপরিসংখ্যানে ১৯৭০-এর দশকের আগে বিশেষ প্রভাব ফেলেনি।

হিন্দুধর্ম

বাঙালি এবং উপজাতি মিলিয়ে ত্রিপুরার অধিকাংশ হিন্দুধর্মাবলম্বীই শাক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত। রাজতান্ত্রিক আমলে হিন্দুধর্মই ছিল ত্রিপুরার রাজধর্ম। সমাজে পূজারী ব্রাহ্মণদের স্থান ছিল অত্যন্ত উঁচুতে। ত্রিপুরার হিন্দুধর্মাবলম্বীদের উপাস্য প্রধান দেবদেবীগণ হলেন শিব এবং দেবী শক্তির অপর রূপ দেবী ত্রিপুরেশ্বরী।

ত্রিপুরায় হিন্দুদের প্রধান ধর্মীয় উৎসবগুলি হল দুর্গাপূজা, নবরাত্রি, কালীপূজা ইত্যাদি। এছাড়াও ত্রিপুরায় পালিত হয় গঙ্গা উৎসব, যাতে ত্রিপুরার উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ দেবী গঙ্গার উপাসনা করে থাকেন।

ইসলাম

ভারতের অন্যান্য অংশের মতই ত্রিপুরাতেও দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় সম্প্রদায় হল মুসলিম সম্প্রদায়। ত্রিপুরার অধিকাংশ ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষই বাংলাভাষী এবং ইসলামের সুন্নি সম্প্রদায়ভুক্ত।

খ্রিস্টধর্ম

২০০১ সালের জনগণনা অনুসারে ত্রিপুরায় খ্রিস্টধর্মাবলম্বীর সংখ্যা ১০২৪৮৯। রাজ্যের অধিকাংশ খ্রিস্টধর্মাবলম্বীই ত্রিপুরি এবং অন্যান্য উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত। ত্রিপুরার খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের মধ্যে প্রধান উল্লেখযোগ্য শাখা হল ত্রিপুরা ব্যাপ্টিস্ট খ্রিস্টান ইউনিয়ন নামক সংগঠনের অধীনস্থ ব্যাপ্টিস্ট সম্প্রদায়। সারা রাজ্যে এই সংগঠনের ৮০০০০ সদস্য এবং প্রায় ৫০০ গির্জা রয়েছে। দ্বিতীয় বৃহত্তম খ্রিস্টীয় সম্প্রদায় হল রোমান ক্যাথলিক গির্জা এবং এই সম্প্রদায়ের ২৫০০০ সদস্য রয়েছেন।

সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়

ত্রিপুরার উত্তরাংশে অরণ্যাবৃত পাহাড় ও উপত্যকা, আর দক্ষিণে গহীন জঙ্গল। প্রতি বছর এখানে ৪,০০০ মিলিমিটারেরও বেশি বৃষ্টিপাত হয়। এখানে প্রায় ৩১ লক্ষ লোকের বাস। প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রায় ৩০৪ জন বসবাস করেন। এখানকার প্রায় ৯০% লোক হিন্দু ধর্মাবলম্বী। তবে স্বল্প সংখ্যক মুসলমান ও খ্রিস্টানও বাস করেন। বাংলা ভাষা ও ককবরক ভাষা এখানকার সরকারি ভাষা। মণিপুরী বা মৈতৈ ভাষাও প্রচলিত।

আগরতলায় ১৯৮৭ সালে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। কৃষিকাজ এখানকার মানুষের জীবিকার প্রধান উৎস। এদের মধ্যে চা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফসল। এছাড়াও এখানে পাট, তুলা, ফলমূল, গম, আলু এবং আখের চাষ হয়। কৃষিকাজের কারণে বনাঞ্চলের কিয়দংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের চাপেও ইদানীং গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে। তবে এত কিছু সত্ত্বেও অঙ্গরাজ্যটির প্রায় অর্ধেক এখনও বনে আবৃত। এখানকার শিল্পকারখানাগুলির ছোট আকারের। এদের মধ্যে অ্যালুমিনিয়ামের তৈজসপত্র তৈরির কারখানা, করাত কল, তাঁতশিল্প উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি রবারের প্ল্যান্টেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ত্রিপুরাতে সড়ক ও মহাসড়ক ব্যবস্থা আছে। আগরতলাতে একটি বিমানবন্দরও আছে।

ত্রিপুরা থেকে ভারতের জাতীয় আইনসভাতে তিনজন সদস্য প্রতিনিধিত্ব করেন। একজন উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় এবং বাকি দুইজন নিম্নকক্ষ লোকসভায় যান। ত্রিপুরাতে চারটি জেলা আছে। ১৯৯৩ সালে উপজাতীয় গেরিলা বিদ্রোহের প্রেক্ষিতে এখানে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রযুক্ত হয়।

চতুর্দশ শতকে রচিত রাজমালাতে ত্রিপুরার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। এটি ছিল ত্রিপুরার মাণিক্য রাজবংশের কাহিনি। মাণিক্য রাজবংশ ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত, ত্রিপুরা ভারতের অংশ হবার আগ পর্যন্ত অঞ্চলটি ধারাবাহিকভাবে শাসন করে। কথিত আছে প্রায় ২৫০০ বছর ধরে ১৮৬জন রাজা এই অঞ্চলটি শাসন করেছেন। ১৯৫৬ সালে ত্রিপুরা একটি ইউনিয়ন টেরিটরি এবং ১৯৭২ সালে একটি অঙ্গরাজ্যে পরিণত হয়।

ত্রিপুরার প্রায় ৭০% লোক বাঙালি। বাকি ৩০% বিভিন্ন আদিবাসী জাতির লোক। এদের মধ্যে ককবরক ভাষায় কথা বলা ত্রিপুরি, জামাতিয়া, রেয়াং এবং নোয়াতিয়া জাতির লোক বৃহত্তম সম্প্রদায়।

ত্রিপুরার বিভিন্ন জনগোষ্ঠী

সম্প্রদায়	ভাষা	ভাষাগোষ্ঠী
বাঙালি	বাংলা	ইন্দো-ইউরোপীয়
ত্রিপুরি	ককবরক	চিনা-তিব্বতি
বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি	বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি	ইন্দো-ইউরোপীয়
মণিপুরি	মৈতৈ	চিনা-তিব্বতি
চাকমা	চাকমা	ইন্দো-ইউরোপীয়
কুকি	কুকি	চিনা-তিব্বতি
মিজো	মিজো	চিনা-তিব্বতি
আরাকানিজ্	আরাকানিজ্	তিব্বতি-বর্মী

ত্রিপুরায় সাক্ষরতার হার প্রায় ৭৩%, যা ভারতের গড় সাক্ষরতার হারের চেয়ে বেশি।

ত্রিপুরার দর্শনীয় স্থানসমূহ

নী র ম হ ল

নীরমহল ত্রিপুরার একটি দর্শনীয় স্থান। নীর অর্থাৎ জলের মাঝে মহলটি স্থাপিত বলে এর নামকরণ করা হয় নীরমহল। মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক বাহাদুরের আমলে নীরমহল তৈরি করা হয়। উল্লেখ্য, ভারতেরই আরেক প্রদেশ রাজস্থানের উদয়পুরে ঠিক একই রকম একটি প্রাসাদ রয়েছে। ইংল্যান্ডের মার্টিন অ্যান্ড বার্ন কোম্পানি ১৯৩০ সালে এর কাজ শুরু করে এবং ১৯৩৮ সালে ভবনটির উদ্বোধন করা হয়।

ত্রিপুরার একটি ছোট এলাকা মেলাঘরে নীরমহল অবস্থিত। রাজধানী আগরতলা থেকে এর দূরত্ব ৫৩ কিলোমিটার।

নীরমহল বাজারের পাশে রুদ্রসাগর নামে বিশাল একটি জলাশয় আছে। এর আয়তন প্রায় পাঁচ দশমিক তিন বর্গকিলোমিটার। রুদ্রসাগরের ঠিক মাঝখানে ত্রিপুরার রাজার গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালীন অবকাশ যাপনের জন্য এই মহলটি নির্মাণ করা হয়। ভবনটি একাধারে যেমন রাজার সৌন্দর্যপ্রিয়তার প্রমাণ দেয়, তেমনি হিন্দু ও মোঘল সংস্কৃতি মিশিয়ে তিনি একটি দর্শনীয় কিছু করতে চেয়েছিলেন, সেই ধারণারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রাসাদের দুটি অংশ। মূল অংশ রয়েছে পশ্চিম পাশে এবং পূর্ব পাশে রয়েছে নিরাপত্তাবাহিনির জন্য দুর্গ। মূল অংশকে আবার দুটি ভাগে ভাগ করা যায়– বাইরের কক্ষ এবং অন্দরমহল। বাইরের কক্ষগুলোর মধ্যে বিশ্রামঘর, খাজাঞ্চিখানা ও নাচঘর উল্লেখযোগ্য। এ ধরনের পাঁচটি কক্ষ সেখানে রয়েছে। এছাড়া দাবা খেলার জন্যও একটি আলাদা কক্ষ রয়েছে। রানী ও অন্যদের জন্য অন্দরমহলে রয়েছে বিশাল ছয়টি কক্ষ। এছাড়া রান্না ঘর, রাজার সভাঘর, আড্ডাঘর ইত্যাদি তো রয়েছেই। বর্তমানে মহলের ভিতর একটি জাদুঘরও রয়েছে।

অন্দরমহলটি এমনভাবে সাজানো ছিল যাতে রাজা-রানী নৌকাভ্রমণ সেরে অন্দরমহলের সিঁড়িতে সরাসরি প্রবেশ করতে পারেন। এছাড়া প্রাসাদের ভেতরের অংশে একটি বিরাট বাগানও রয়েছে। রাজা-রানীর বেড়ানোর জন্য ঘাটে সবসময় মোটরচালিত নৌকা থাকত।

বাইরের দিকে দুটি ঘাট রয়েছে। সেখানে কর্মচারীরা স্নান করত এবং ঘাটগুলো তাদের যাতায়াতের জন্যও ব্যবহৃত হত।

তবে মহারাজা অনেক অর্থ খরচ করে এই প্রাসাদ নির্মাণ করলেও খুব বেশি দিন তিনি ভোগ করতে পারেননি। মাত্র সাত বছর তিনি এই প্রাসাদ ব্যবহার করেছে। কারণ মাত্র ৩৯ বছর বয়সে তিনি মারা যান।

মহারাজা মারা যাওয়ার পর বহুদিন এটি পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। এ সময় আস্তে আস্তে এটি ঔজ্জ্বল্য হারাতে থাকে। অবশেষে ১৯৭৮ সালে ত্রিপুরার তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এর দায়িত্ব নেয় এবং ভবনটি রক্ষায় সচেষ্ট হয়। ১৯৯৫-'৯৬ অর্থবছরে ভবনটিতে বড় ধরনের সংস্কার করা হয়। বর্তমানে এটিকে একটি আকর্ষণীয় পর্যটন স্পট হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। প্রতি শীতের সময়ে লাইট অ্যান্ড লেজার শোর মাধ্যমে পর্যটকদের আকৃষ্ট করার পাশাপাশি এই প্রাসাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য তুলে ধরা হয়। এছাড়া প্রতিবছর সেপ্টেম্বরে রুদ্রসাগর লেকে নৌকাবাইচের আয়োজন করা হয়।

নীরমহলে থাকা-খাওয়া-যাওয়া

ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা থেকে বাসে সরাসরি মেলাঘর যাওয়া যায়। এছাড়া জিপ ও অন্যান্য গাড়ি ভাড়া করে সেখানে যাওয়া যাবে। বাস ভাড়া ৪০ টাকা। সময় লাগে দুই ঘণ্টা। মেলাঘর বাসস্ট্যান্ডে সাগরমহল ট্যুরিস্ট লজে রিকশা দিয়ে যেতে হবে। ভাড়া ১০ টাকা।

সাগরমহল ট্যুরিস্ট লজটি ত্রিপুরার তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অধীনে। এতে আধুনিক সুযোগসুবিধাসহ মোট ৪৪টি সিট রয়েছে। এসি ও নন-এসি দু'ধরনের সুবিধাই রয়েছে রুমগুলোতে।

• নিজস্ব প্রতিনিধি

BE 100% SURE

Dettol

BPMPA

Proud Partner of icddr,b

ডেটল সাবান সুরক্ষা দেয় ১০০ রোগবাহী জীবাণু পর্যন্ত#

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত যে নতুন ডেটল সাবান আপনার পরিবারকে ১০০টি পর্যন্ত রোগবাহী জীবাণু থেকে সুরক্ষা দেয়। এজন্যই ডাক্তাররা সবসময় পরামর্শ দিয়ে আসছেন ডেটল ব্যবহার করার জন্য।

নতুন

সুরক্ষা দেয়

১০০

রোগবাহী জীবাণু পর্যন্ত#

This is supported by Microbiological assessments versus bacteria and fungi at an external GLP facility (Bioscience Laboratories, Bozeman, Montana, USA)

** Dettol Original Soap is a Grade-1 soap

DettolBD

ভ্রমণ

চিলিকা হ্রদের দেশে

দীপিকা ঘোষ

কথাসাহিত্যিক ও কলাম লেখক দীপিকা ঘোষের জন্মস্থান ফরিদপুর, বাংলাদেশ। বর্তমানে আমেরিকা প্রবাসী। ছেলেবেলা থেকে লেখালেখির সঙ্গে জড়িত। কবিতা দিয়ে শুরু। সমাজের বিচিত্র চরিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পরবর্তীকালে কথা-সাহিত্যে প্রবেশ। উপন্যাস, ছোটগল্প এবং প্রবন্ধ মিলিয়ে প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা একুশ।

ঢাকা, কলকাতা এবং উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও সংবাদপত্রে তাঁর ছোটগল্প, উপন্যাস এবং প্রবন্ধ নিয়মিত প্রকাশিত হয়।

চার.

ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে দিল্লির 'ইন্দিরা গান্ধী ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে' পৌঁছতে প্লেন এতটাই বিলম্ব করে ফেলল যে সেদিনের মত মিস করতেই হল ভুবনেশ্বরের ফ্লাইট। দিল্লির এই বিশাল বিমানবন্দরটি সর্বদা যাত্রীদের ভিড়ে সরগরম থাকে সে কথা আগে থেকেই শোনা ছিল। প্লেন থেকে নেমে ভেতরে এসে সে প্রত্যয় গাঢ়তর হল। এয়ারপোর্টের অভ্যন্তরে বিদেশী যাত্রীর সংখ্যা চোখে পড়ছে উল্লেখযোগ্য হারে। দ্বিধাহীন পায়ে তারা এমনভাবে এগিয়ে চলেছেন যাতে উপলব্ধি করা কঠিন নয়, এখানকার পরিবেশে যথেষ্টই স্বচ্ছন্দ তারা। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অভ্যন্তর। স্টাফদের চালচলন যথেষ্ট স্মার্ট– বন্ধুভাবাপন্নতায় যাত্রীদের সাহায্য করতে সদাই যারা প্রস্তুত। লাগেজ সংগ্রহ করে ডিপারচার কাউন্টারে পৌঁছতেই একজন জানিয়ে দিলেন– দুঃখিত, দিল্লি থেকে ভুবনেশ্বরের জন্য আজ আর কোন ফ্লাইট নেই আমাদের। রাতটা তাই হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আমাদের ট্যাক্সি ড্রাইভার পৌঁছে দেবেন সেখানে। কাল সকাল আটটায় আবার হোটেল গেট থেকে নিয়ে আসবেন এয়ারপোর্টে। বলেই আমাদের সব তথ্য জেনে ভদ্রলোক পরের দিনের জন্য বোর্ডিং পাস ধরিয়ে দিলেন হাতে। তার নামটা ডেস্কে গিয়ে দাঁড়াতেই চোখে পড়েছিল– 'অমৃতবান সাহোতা'। বোঝা গেল ভদ্রলোক জাট বংশোদ্ভূত পঞ্জাবি পরিবারের সন্তান। কয়েক মিনিটের মধ্যে অমৃতবান সাহোতার নির্দেশে উনিশ কুড়ি বছরের এক কর্মতৎপর উচ্ছল তরুণ আমাদের মালবোঝাই কার্টটাকে ঠেলে নিতে নিতে বাইরে এসে দাঁড়াল। ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে এসে পৌঁছতে দশ মিনিটের বেশি সময় লাগেনি। কিন্তু তারই মধ্যে অবিরাম আলাপচারিতায় সে নিজের কথা জানিয়ে আমাদের বিষয়েও জেনে নিল কিছুটা। প্রথমেই একগাল হেসে নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলল আমার নাম ইয়াতিন।

ভাল বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম– ইয়ামিন? নেহি। নেহি ম্যাম। ইয়াতিন। ওয়াই এ টি আই এন, ইয়াতিন। সঙ্গে সঙ্গে বানান করে জোরে নিজের নাম উচ্চারণ করল ইয়াতিন। আমার চিরকেলে বাঙালি স্বভাব,

সুযোগ পেলেই আচ্ছাদন উন্মোচন করে বেরিয়ে পড়ে বাইরে। হেসে বললাম– ওঃ হোঃ যতীন? তাই বল! আমরা বাঙালিরা ওই ইয়াতিনকেই বলি 'যতীন'। যতীনের মুখে এবার পূর্ণ হাসির ফোয়ারা ছুটল– আপনারা বাঙালি? হ্যাঁ। তুমি? ম্যাঁয় সব কুছ কর রহা হুঁ, দিদি! মানে? মানে আমি যেমন হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম, খ্রিস্টান, ইহুদি, পার্সি আছি তেমনি আছি সব ভাষার মানুষ হয়েও। তার মানে তুমি অনেকগুলো ভাষায় কথা বলতে অভ্যস্ত? ঠিক অভ্যস্ত নই ম্যাম। তবে হিন্দি আর ইংরেজির মত অনর্গল বলতে না পারলেও বহু ভাষাতেই কথা বলে কাজ চালিয়ে যেতে পারি এই আর কি। বাঃ! কিন্তু এত ভাষা একসঙ্গে শিখলে কী করে? ওই শেখা হয়ে গেল। এখানে তিন বচ্ছর ধরে কাজ করছি তো, নানা দেশের প্লেন প্যাসেঞ্জারদের সঙ্গে রোজ চলতে চলতে শেখা হয়ে গেল। সে তো সাংঘাতিক ব্যাপার! খুব বড় স্মৃতিধর না হলে এভাবে ভাষা আয়ত্ত করা অনেক শক্ত কাজ ইয়াতিন! সবাই বলে বটে আমার মেমোরি নাকি খুব শার্প! বলেই বিগলিত ভঙ্গিতে ইয়াতিন এক ঝলক নিষ্পাপ খুশির হাসি ছড়াল তার সুডোল মুখে। আমি গলায় স্নেহ ঢেলে বললাম– সবাই ঠিক কথাই বলে ইয়াতিন! তুমি একটি জিনিয়াস!

আমার মন্তব্যে উত্তর দিল না যতীন। কেবল লজ্জার আলতো আভা লাবণ্যের পশমী পরশ নিয়ে ছড়িয়ে পড়ল কচি মুখের রেখায় রেখায়। খানিকটা সামনে এগুতে কাচের দেয়ালের বাইরে নজরে পড়ল এয়ারপোর্টের ট্যাক্সিড্রাইভার রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষারত। বোঝা গেল, প্যাসেঞ্জারদের হোটেলে পৌঁছে দিতেই এই প্রতীক্ষা তার। দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে কয়েক পা অগ্রসর হতে না হতে সহসা এক ঢল তপ্ত হাওয়া বন্যভাবে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল সারা দেহে। প্রচণ্ড উত্তাপ সেপ্টেম্বরের পড়ন্ত বিকেলেও ওয়েস্টার্ন রাজ্যের ফারনেসের মত জ্বালা ধরিয়ে দিল গোটা শরীরে। ওপরের দিকে এক পলক নজর রাখতে যেতেই ঝাপসা হয়ে গেল চোখের দৃষ্টি। সূর্যের কঠিন তাপে পুরো আকাশটা যেন ঝাপসা শামিয়ানায় ধূসর হয়ে গেছে টেনেসি অঙ্গরাজ্যের স্মোকি মাউন্টেনের মত। কে জানে হয়তো এমন আকাশের ছবি আঁকতে গিয়েই কবিগুরু বলেছিলেন কিনা– 'প্রখর দহন তাপে, তৃষায় আকাশ কাঁপে'। যতীন ট্যাক্সির ট্রাঙ্কে আমাদের লাগেজ তোলা শেষ করে দুই হাত জড়ো করল নমস্কারের ভঙ্গিতে। মুখে বলল– নমস্তে।

জবাবে টিপস দিতে গিয়ে সঙ্গে ব্যাগে রাখা একটি নতুন রোলারবল পেন তার হাতে দিয়ে বললাম–

এটা তোমার জন্য ইয়াতিন।

স্বচ্ছ দৃষ্টি মেলে কলমটিকে কয়েক মুহূর্ত পলকহীন চোখে দেখল ইয়াতিন। সম্ভবত এ রকম সে আশা করেনি। ঠোঁটের ফাঁকে চিকন হাসির পরশ লাগল আবেগে। পরে নরম স্বরে বলল–

ইয়ে তো বহুৎ আচ্ছা হ্যায়! তারপরেই ফের নমস্কারের ভঙ্গিতে জোড় হাতে জিজ্ঞেস করল–

এখানে আবার কবে আসবেন দিদি?

ঠিক বারো দিন পরে।

তখন দেখা হবে আশা করি? কথাগুলো উচ্চারণ করে সে ক্ষণিকের জন্য চোখ তুলতেই দেখি অশ্রুভারে চোখের রাজ্য হঠাৎ ঝাপসা হয়ে গেছে তার। কোন প্রশ্ন করার আগে সম্ভবত অপ্রস্তুত হয়েই যতীন এবার বলল–

আসলে এটা পেয়ে আমার দিদির কথা মনে পড়ে গেল! দু'বছর আগে বিয়ের পরে স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরঘর যাওয়ার সময় বাস এ্যাক্সিডেন্টে দু'জনেরই একসঙ্গে মৃত্যু হয়েছিল! আমাকে বড় ভালবাসত! আমার তিন বছর বয়সে বাবা-মা মারা যাওয়ার পরে দিদি আর আমি খুব কষ্ট করে বড় হয়েছিলাম একা একা, সেসব কথা মনে পড়ে গেল!

বুঝলাম সদ্য কৈশোর পেরুনো ছেলেটির মনে দিদির কথা স্মরণ করে কৃতজ্ঞতার ভালবাসা তরল আবেগে জোয়ার তুলেছে। সান্ত্বনার পরশ লাগাতে তার কাঁধে সস্নেহে হাত ছুঁয়ে বললাম– ফিরে যাওয়ার পথে আমাদের আবার দেখা হবে ইয়াতিন! তখন তোমার ফোন নাম্বার সঙ্গে নিয়ে যাব। ফোন করব মাঝে মাঝে। খুব ভাল থেকো!

ট্যাক্সিতে আমরা ছাড়া আরও তিনজন ভদ্রলোক উঠেছেন এয়ারপোর্ট থেকে। তাদেরও গন্তব্যস্থল সম্ভবত এয়ারপোর্ট প্রদত্ত হোটেল। বাইরের রোদ আর উত্তাপ উপেক্ষা করে ট্যাক্সি ছুটে চলেছে রাজপথ ধরে। ভেতরের ফুটন্ত উষ্ণতায় মাত্র কয়েক মিনিটেই ভিজে জবজবে হয়ে গেল আমার পোশাক-পরিচ্ছদ। জানালা খুলে দিলাম বাইরের হাওয়া পাওয়ার প্রত্যাশায়। কিন্তু মুহূর্তে চলন্ত গাড়ির জানালা গলে এক ঝলক বাতাস ছুটে এসে ছুঁয়ে দিতেই মনে হল, এ হাওয়া নয়, আগ্নেয়গিরির গরম স্রোত।

চলতে চলতে শরৎ ঋতুর শান্ত মেজাজের আভাস এখানকার প্রকৃতির

কোথাও নজরে পড়ছে না। এয়ারপোর্ট ছেড়ে অনেক দূরে সরে যেতেই ইয়াতিনের মুখ আবার ভাসতে লাগল চোখের পাতা জুড়ে। মন বলল– সে মুখে কৈশোরের ছায়া অবলুপ্ত হয়নি এখনো। মনে পড়ল ছেলেটির অশ্রুসজল চোখ। লম্বা ছিপছিপে কালো তরুণ পলকের জন্য অন্তরের বিগলিত পরশ দিয়ে বড়ই মধুর সম্বোধনে 'দিদি' বলে ডেকেছিল আমাকে। সবার শেষে সব ছাপিয়ে মনে পড়ল সেই কথাগুলোও– ম্যাঁয় সব কুছ কর রহা হুঁ!

এই বিরাট বিশ্বে পরিবার পরিজন হারিয়ে সম্পূর্ণ একা হয়েছে বলেই কি এমন মন্তব্য ছিল তার? একা হয়েই কি বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে গিয়েছে ছেলেটি? যতীন বোধকরি জগতের সবচেয়ে বড় তত্ত্বকথাটি সেই কারণেই অমন সহজ ভাষায় সরলভাবে বলতে পেরেছিল– 'আমি তো সবকিছুই আছি দিদি'!

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে মধুর স্নেহে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল আমার বুকের ভেতর থেকে। অজান্তেই অন্তস্থলের আশীর্বাদ জানিয়ে বললাম–

ভাল থাকিস ভাই!

পাঁচ.

দিল্লি থেকে ভুবনেশ্বরের 'বিজু পাটনায়েক ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে' অবতরণ করল আমাদের বিমান। বিমানবন্দরটি আকারে অতি ছোট। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের নিরালায় লালিত বড় আটপৌরে তার চেহারা। চারদিকে সবুজ গাছের বেষ্টনী। খোলা হাওয়ায় চারপাশে উদোম বাতাসের ঢেউ। বাইরে আসতেই চোখে পড়ল, মেঘলা আকাশের শরীর চুঁইয়ে ঝিরঝির করে ঝরে পড়ছে ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি। চারপাশে চলতে ফিরতে, সব দৃশ্যপাট দেখতে দেখতে অজান্তেই মনের তলায় সতৃপ্তিতে ছুঁয়ে গেল ভাললাগার অলস অনুভব। প্রকৃতির এমন নিরাভরণ রূপের কথা কতবার পড়েছি বাঙালি কবির অসাধারণ সব ললিত বর্ণনায়। যে বর্ণনায় সুধার কোন শব্দ নেই। আছে শুধু অনুপম স্নিগ্ধতার নিবিড় পরশ। স্নিগ্ধতার সেই নিবিড় পরশ ছড়িয়ে ছিল চারপাশেই। তাই অজান্তেই মনের তলায় এমন তৃপ্তিবোধের ছোঁয়া।

এবার আমাদের গন্তব্যস্থল পুরীর হোটেল, 'সি প্যালেস'। দুর্দান্ত বঙ্গোপসাগরের কোল ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এই হোটেলটিতে শুয়ে বসে সারাদিন শোনা যাবে অশ্রান্ত সাগর ঢেউয়ের ফুঁসে ওঠার গর্জন। যেন খাঁচায় বন্দী ক্রুদ্ধ সিংহীর বিদ্রোহ ঘোষণার তীব্র সোচ্চার, এমন কথাই জানিয়েছিলেন পুরী শহরে আমাদের যোগাযোগ প্রতিনিধি শ্রী প্রকাশ শতপতি। শতপতির চারপুরুষের বসতবাড়ি শহরের চক্রতীর্থ চৌরাস্তার মোড়ে। বাক্যালাপে কুশলী হওয়ায় প্রবাসী ট্যুরিস্টদের সঙ্গে নিয়মিত স্বচ্ছন্দ তার যোগাযোগ। গোটা উড়িষ্যা প্রদেশের সবগুলো দর্শনীয় স্থান, সবরকম গলিঘিঞ্জির ব্যাখ্যা এবং ইতিহাস ভদ্রলোকের নখদর্পণে। ডক্টর ঘোষ আজীবন সরাসরি সোজা পথে চলার মানুষ। কোন অচেনা পথে সামান্যতম ঝুঁকি রেখেও চলতে রাজি নন। আমেরিকা থেকে আগেই তাই সব ব্যবস্থা পাকা করে রেখেছিলেন মিস্টার শতপতির এ্যাকাউন্টে প্রয়োজনীয় টাকা পাঠিয়ে। এখানে আসার আগে প্রকাশবাবুর সঙ্গে অন্তত পাঁচবার বাক্যালাপ হয়েছে এ বিষয়ে। নানা আলোচনার পরে আমি উন্মুক্ত আকাশ আর সমুদ্র দেখতে ভালবাসার কথা উল্লেখ করতেই হাসতে হাসতে বলেছিলেন– আচ্ছা, আচ্ছা! আচ্ছাসে একখানা হোটেলের ব্যবস্থাই আপনারা পেয়ে যাবেন ম্যাডাম! এসে দেখুন না, হোটেল সি প্যালেস খুব ভাল লাগবে আপনাদের! কোন রকম অসুবিধে হলে জানিয়ে দেবেন সঙ্গে সঙ্গে।

আমাদের পরের প্রশ্ন ছিল–

হোটেলে আসার জন্য এয়ারপোর্টে ট্যাক্সি পাওয়া যাবে তো?

চিন্তা করবেন না! সে ব্যবস্থাও আমিই করে রাখব। বুনু মোহান্তি নামের এক ট্যাক্সি ড্রাইভার আনতে যাবে আপনাদের। ওই-ই পৌঁছে দেবে হোটেলে। তার বুকের ওপর ইংরেজিতে নাম লেখা থাকবে। দেখলেই চিনতে পারবেন।

প্রকাশ শতপতির পাঠানো সেই ড্রাইভার বুনু মোহান্তির অনুসন্ধানেই আমাদের দুইজোড়া চোখের প্রখর দৃষ্টি এবার আছড়ে পড়তে লাগল সর্বত্র। বাইরে অপেক্ষমাণ মানব সমাগমে ভিড় তেমন ছিল না। সম্ভবত এয়ারপোর্টে স্যাঁতস্যাঁতে বৃষ্টিভেজা পরিবেশ বলেই জনসমাবেশ কম আজ। সুতরাং বুনুকে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আবিষ্কার করে ফেললাম আমরা। তার বয়স সম্ভবত পঁচিশের কাছাকাছি। আকারে ছোটখাটো। মাথার ওপরে ছাতার বদলে লম্বা এক প্লাস্টিকের আচ্ছাদন। একটু দূরে এমনভাবে মাথা ঢেকে দাঁড়িয়েছিল যে কেবল বুকের ওপর ইংরেজিতে নাম লেখা কাগজ ছাড়া অন্য কিছু চোখে পড়া ছিল দুঃসাধ্য। অনেকখানি কাছে গিয়ে তার নাম উচ্চারণ করে হাত তুলতেই বুনুর নিটোল মুখে সরল হাসির ফুলঝুরি ফুটল। ঝিরঝিরে বৃষ্টি মাথায় করে আমরা ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠলাম। উঠে বসতেই জোর বৃষ্টি ঝেপে এল। ড. ঘোষ ভেবেছিলেন বুনুর পক্ষে ইংরেজি, বাংলা কোনটাই জানা সম্ভব নয়।

তাই অদ্ভুত হিন্দিতে একটু পরেই জিজ্ঞেস করলেন–

বুনু কোন ঢাকনা টাকনা হ্যায়? এবং ইশারায় বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন– জোর বাতাসে খোলা দরজায় বৃষ্টির ছাঁট লেগে ভিজে যাচ্ছে পরিচ্ছদ!

জবাবে অপ্রস্তুত মুখে কাঁধ ঘুরিয়ে পলকের জন্য এক ঝলক পেছনে তাকাল বুনু। মাথা নাড়ল নেতিবাচক উত্তরে। বোঝা গেল মিস্টার ঘোষের অনুমানই সত্য। বাংলা এবং ইংরেজি কেবল নয়, বুনুর বোধকরি অদ্ভুত হিন্দি ভাষাটাও বোধগম্য হয়নি। এ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে ফের মুখ খুললেন ঘোষ–

দেখলে? শতপতির কাণ্ডকারখানাটা দেখলে? কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা পাঠালাম অথচ এমন একখানা জাঙ্ক জিনিস পাঠিয়েছে যে ট্যাক্সি বলে চেনাই যায় না! দরজা জানালার কোনটাই অক্ষত নেই! ইঞ্জিনটা ঠিক আছে কিনা তাই বা কে বলতে পারে! হোটেলে গিয়ে শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে পারলে হয়!

চাপা গলায় বললাম– এসব কথা অত জোরে জোরে কেন বলছ? ও বাংলা বলতে না পারলেও বুঝতে পারছে না সে রকম নাও তো হতে পারে!

– পারলে পারুক! মিথ্যে তো কিছু বলছি না! এতটা পথ বৃষ্টি ভিজে

অসুখ করলে তখন কী হবে? শতপতি একে না পাঠালে ট্যাক্সি না হয় নিজেই যোগাড় করে নিতাম!

কথা শেষ হতে না হতেই বুনু সামনের আসন থেকে তার ব্যবহৃত প্লাস্টিকের আচ্ছাদনখানা অসহায় মুখের চেহারা করে এগিয়ে ধরল ঘোষের দিকে। এতক্ষণে মনে হল আমার স্বামীর সব বক্তব্যই বোধগম্য হয়েছে তার।

আমাদের ট্যাক্সি উল্কাবেগে ছুটছে। বৃষ্টির ধারা কখনো প্রবল হয়ে কখনো শিথিলতায় ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে ঝরছে। রাস্তার দুই পাশে পল্লীবাসীদের বাড়িঘর। জলবিধৌত উঠোন। গরু বাঁধার গোয়াল। কোথাও ঘন গাছাপালার আড়াল। কোথাও আবার পানাবোঝাই ছোট বড় জলাশয়। বৃষ্টির তোড়ে তাদের বুকের ওপর জলের খই ঝাঁকে ঝাঁকে ফুটছে। এমন শান্ত সৌন্দর্যের উদোম রূপ কোনদিন দেখিনি জীবনে। আশ্চর্য ভাললাগায় তাই মুগ্ধতার প্রলেপ পড়ছে বুকের মধ্যে। কুড়ি মিনিট চলার পরেই রাস্তার পাশে ট্যাক্সি থামাল বুনু। দেখেই ঘোষ সংশয় নিয়ে তাকালেন আমার মুখে–

সেরেছে! ইঞ্জিনটাও বোধকরি গেল এবার!

ট্যাক্সিচালক ঠিক তক্ষুনি মুখ খুলল পেছনে তাকিয়ে– স্যার ডাব এনে দিই? এখানকার ডাব খেতে খুব ভাল!

বুনুর বক্তব্য শুনে বিস্ময়ের আকুতিতে ঘোষ প্রথমেই আমার মুখে তাকালেন। ছেলেটা স্পষ্ট উচ্চারণে বাংলায় কথা বলছে। হেসে জিজ্ঞেস করলাম– বুনু, তুমি বাঙালি?

না ম্যাডাম। তবে বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি তিনটেই বলতে পারি। শতপতি স্যারের সঙ্গে পনেরো বছর আছি কিনা! সবটাই তাই শেখা হয়ে গেল! ডাব খাবেন তো?

হ্যাঁ নিশ্চয়ই। তিনটে ডাব নিয়ে এস। সঙ্গে স্ট্র।

এতক্ষণে নজরে এল রাস্তার পাশের ঢালু জায়গাটায় ছোট্ট কুটিরের মধ্যে একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি অপেক্ষা করছেন খরিদ্দারদের জন্য। কাছেই বাইরে পলিথিনের নিচে কচি ডাবের স্তূপ। তার থেকে কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনটি ডাব কেটে দাম মিটিয়ে চলে এল বুনু। বললাম– তোমার প্লাস্টিকের ঢাকনাটা মাথায় দিয়ে গেলে না কেন? শুধু শুধু বৃষ্টি ভিজলে!

বুনু ডাবের জল পান করতে শুরু করেছিল। কয়েক সেকেণ্ড নীরব থেকে কৃতজ্ঞতায় হাসল লজ্জিতভাবে– একটু ভিজলে অসুবিধে নেই। আমার অভ্যাস আছে।

ঘোষ বললেন– বৃষ্টির জলে আমার কিন্তু অ্যালার্জি আছে। এক ফোঁটা গায়ে পড়লেই...।

বুনু রীতিমত বিজ্ঞের মত মন্তব্য করল সঙ্গে সঙ্গে– জানি। এর আগে অস্ট্রেলিয়া থেকে সূর্যমন্দির দেখতে এক সাহেব পরিবার এসেছিলেন আমার ট্যাক্সিতে। তখনো বৃষ্টি হতেই সাহেবের স্ত্রী বলেছিলেন– বৃষ্টির পানিতে সাহেবের বড় অসুখ হয়। তখন জুন মাস, বর্ষার মৌসুম শুরু হয়েছে। হোটেলে ওঠার আগে ওঁরা আমাকে দিয়ে একজোড়া ছাতা কিনিয়েছিলেন আমার পরিচিত এক দোকান থেকে।

বেশ তো, তাহলে আমাদের জন্যও সেখান থেকে একজোড়া ছাতা কিনে নিয়ো।

ঠিক আছে স্যার। দোকানটা পুরী শহরের মধ্যেই। আপনাদের হোটেলে নামিয়ে দিয়ে আমি পরে কিনে দিয়ে আসব।

ট্যাক্সি আরও খানিকটা চলার পরে বারিপাত আর বাতাসের বেগ থিতিয়ে এল এবং কিছুক্ষণের মধ্যে নরম সূর্যের আলোয় ভরে উঠল চারপাশ। বুনুর সঙ্গে ঘোষের আলাপচারিতা জমে উঠেছে বেশ। এরমধ্যে প্রস্তাবও দিয়ে রেখেছে, আগামীকাল কোনার্ক সূর্যমন্দিরে বুনুই যেন পৌঁছে দেয় আমাদের। কাল ন'টায় ব্রেকফাস্ট সেরেই হোটেল গেটে তার জন্য অপেক্ষমাণ থাকব আমরা। ড. ঘোষের মনের ওয়েদার ফোরকাস্ট এখন চমৎকার। জানি, এই জাঙ্ক ট্যাক্সিটির ব্যাপারে তার অন্তরে কোনরকম বিরাগ এখন নেই আর।

পুরী শহরে ঢুকতে না ঢুকতেই একটুখানি তুলনামূলক নিরালা স্থানে বছর ত্রিশের একজন মানুষ সহসা হাত উঁচিয়ে ট্যাক্সি থামাল আমাদের। আকার আয়তনে বুনুর প্রায় দেড়গুণ সে। রাস্তার পাশে আর একখানা ট্যাক্সির গায়ে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ। বুনু কোন কথা না বলে সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সি ছেড়ে চলে গেল সেই মানুষটির কাছে। আর যেতেই তীব্র বচসা শুরু হল দু'জনের মধ্যে। তাদের আঞ্চলিক ভাষার দ্রুতকথন অবশ্য হৃদয়ঙ্গম হল না। কেবল ড. ঘোষের মুখের ওপর অপ্রসন্নতা ছড়াল– হোটেলে গিয়ে আজ আর লাঞ্চ খাওয়া হবে না দেখছি!

তাহলে বাইরে কোথাও খেয়ে নেব।

কোথায় খাবে? ওয়াকিং ডিসট্যান্সের মধ্যে কোন রেস্টুর‍্যান্ট পাওয়া যাবে কিনা ঠিক আছে? ওদের মধ্যে কী নিয়ে যুদ্ধ শুরু হল কে জানে! এই শতপতি মানুষটা পদে পদে বিপত্তি ঘটাবে দেখছি!

মিনিট পাঁচেক পরে মহাযুদ্ধ শেষ করে বুনু মুখ লাল করে ফিরে আসতেই ঘোষ বিরক্তিভরে জানতে চাইলেন– কী ব্যাপার বুনু? হঠাৎ ট্যাক্সি থামিয়ে...! ওই লোকটা কে?

সে উত্তর দেবার আগেই লম্বা চওড়া মানুষটা কাছে এসে যেন কিছুই হয়নি এমনিভাবে একগাল হেসে বলল– হোটেল সি প্যালেসে আমিই আপনাদের পৌঁছে দেব স্যার। এবার আমার ট্যাক্সিতে উঠুন। বলে কিছু সমঝে ওঠার আগেই আমাদের লাগেজগুলো সে নিজের ট্র্যাঙ্কে তুলে দিল।

কিন্তু কোন অবস্থাতেই সবকিছু পরিষ্কার না করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মানুষ মিস্টার ঘোষ নন। তিনি সহসা অতি গাম্ভীর্যে বিরক্তি নিয়ে অচেনা লোকটাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন– না না না, আগে পুরো ব্যাপারটা আমাকে বুঝতে দাও! তারপর এসব হবে! হঠাৎ ট্যাক্সি বদল কেন?

পরিস্থিতি বিবেচনা করে বুনু মুখ খুলল এতক্ষণে– অসুবিধে নেই স্যার। ও আমাদেরই লোক। ওর নাম বলরাম।

হোটেল সি প্যালেসে প্রবেশের পরে চেক ইন করে নির্দিষ্ট রুমে ঢুকতে ঢুকতে ঘড়ির কাঁটা বিকেল প্রায় তিনটের কাছাকাছি পৌঁছে গেল। ভাগ্য ভাল, সময় পেরিয়ে গেলেও দুপুরের খাবার আমরা ঘরে বসেই পাব একটু আগে জানিয়ে দিয়েছিল ম্যানেজার কাম রিসেপশনিস্ট দীনকৃষ্ণ মিশ্র। দীনকৃষ্ণকে দেখে আমার বুকের ভেতরে মাতৃভাবের পরশ লেগেছে। ছেলেটি বড় ভাল। মুখে সর্বদাই প্রফুল্ল হাসি। মাত্র পনেরো মিনিটের মধ্যে ড. ঘোষের সঙ্গেও একটি মধুর সম্পর্ক তৈরি হয়েছে তার। অবশ্যই সে সম্পর্ক ঘোষের সঙ্গে আমার মত পুত্রবৎ নয়। বন্ধুত্বের।

জামাকাপড় বদলে হাতমুখ ধুয়ে ফ্রেশ হতে না হতেই বাইরে থেকে নক পড়ল দরজায়। দরজা খুলতেই কিশোর কণ্ঠের আওয়াজ এল কানে। সে হিন্দিতে বলল– খাবার এনেছি স্যার। আসব ভেতরে? আমি ওয়াশরুম থেকে শুনতে পাচ্ছি ঘোষ বলছেন– হ্যাঁ এস। টেবিলের ওপর রেখে যাও। আর আমাদের জন্য আপাতত চারটে জলের বোতল কিনে দিয়ে যাও প্লিজ! কতক্ষণ লাগবে?

বেশি সময় নয় স্যার– হোটেল থেকে বেরিয়ে কয়েক গজ সামনে গেলেই জলের দোকান।

আচ্ছা তাহলে টাকাটা নিয়ে যাও। আমরা বোতল ছাড়া এখানে অন্য জল খেতে পারি না।

জানি। এখানে যারাই বাইরে থেকে আসে, তারাই বোতলের পানি খায়।

এরপর জল নিয়ে মিনিট দশেক পরেই ফিরে এল ছেলেটি। বোতলগুলো রেখে টাকা ফিরিয়ে দিতে আমার স্বামী বললেন– না না ফেরত দিতে হবে না। ওটা তোমার।

কিন্তু এ তো অনেক স্যার! আমার রেট দশ রুপি।

তা হোক। আজকের মত নিয়ে নাও।

ছেলেটি কী ভাবল কে জানে। মুহূর্তের জন্য মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থেকে ভারী কোমলস্বরে বলল– আপনার যখন যা দরকার হবে, আমাকে বলবেন স্যার। কিনে এনে দেব।

আমি ততক্ষণে ওয়াশরুম ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছি। এসে দেখি বারো-তেরো বছরের একবারেই একটি বাচ্চা ছেলে সে। চলে যাবার সময় আমার দিকে নজর পড়তে হেসে জিজ্ঞেস করলাম– কী নাম তোর?

সে পলকের জন্য চোখ ফেলল আমার মুখে। পরক্ষণেই দৃষ্টি নামিয়ে একইভাবে নরমস্বরে জবাব দিল– আজ্ঞে, চৈতন পট্টাসনি। বলেই আর দাঁড়াল না। বুঝলাম ওর কচি মনের রেখায় রেখায় কৃতজ্ঞতার উতরোল জেগেছে। মুখের চেহারা জুড়ে তাই অন্তরের এমন আলোড়ন।

• পরবর্তী সংখ্যায়

দীপিকা ঘোষ
প্রবাসী বাঙালি কথাসাহিত্যিক

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

কালজয়ী কথাশিল্পী

বাংলা ভাষার অন্যতম শক্তিমান কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ব্রিটিশ ভারতের বাংলা প্রদেশের বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামে। তাঁর বাবার নাম হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মায়ের নাম প্রভাবতী দেবী। তাঁদের বাড়িতে নিয়মিত কালী ও তারামায়ের পুজো হত। তাঁর বাবা-মা দু'জনেই ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ও আদর্শনিষ্ঠ। তার জন্মের আগে প্রভাবতী ও হরিদাসের জ্যেষ্ঠপুত্রের মৃত্যু হয়। এমতাবস্থায় পরিবারে তারামায়ের পুজো শুরু হওয়ার ঠিক দশমাস পরে তার জন্ম হয়। তারামায়ের দয়ায় জাত বলেই তার নাম রাখা হয় তারাশঙ্কর। তারাশঙ্কর ছোটবেলায় মাদুলি তাবিচ কবচ এবং বহু সংস্কারের গণ্ডিতে বড় হয়ে ওঠেন। সততা, ধর্মভাব, ভক্তি ও ধর্মশাস্ত্রীয় বিশ্বাস তিনি মায়ের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। যদিও পরবর্তী জীবনে এ সব বিশ্বাস নিয়ে অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও জিজ্ঞাসা তার মনকে আলোড়িত করেছে।

১৯১৬ সালে স্থানীয় যাদবলাল বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে তারাশঙ্কর কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হন।

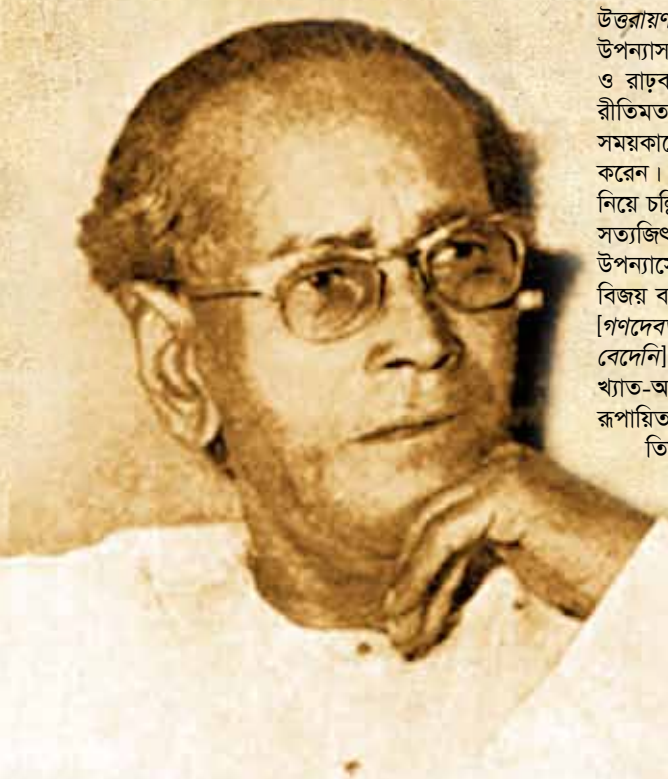

ইতোমধ্যে তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন, স্ত্রীর নাম উমাশশী। তাঁদের সনৎ ও সরিৎকুমার নামে দুই পুত্র এবং গঙ্গা, বুলু (অকালপ্রয়াতা) ও বাণী নামে তিন কন্যা জন্মগ্রহণ করে।

গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের অপরাধে কলেজ থেকে বহিস্কৃত হলে তারাশঙ্কর সাউথ সাবারবার্ন কলেজে ভর্তি হন কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্য ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সম্পূর্ণ করতে পারেননি। ১৯৩০ সালে তিনি প্রথম কারাবরণ করেন। বছরখানেক পরে মুক্তি পেয়ে তিনি সাহিত্যসাধনায় ব্রতী হন। '৩২ সালে তাঁর প্রথম উপন্যাস *চৈতালী ঘূর্ণি* প্রকাশিত হয়। উপন্যাস হাতে নিয়ে তিনি শান্তিনিকেতনে যান রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। সেই তাঁদের প্রথম সাক্ষাৎ।

১৯৪০ সালে তিনি সপরিবারে কলকাতায় বসবাস শুরু করেন। এরপর একে একে *পাষাণপুরী*, *নীলকান্ত*, *রাইকমল*, *প্রেম ও প্রয়োজন*, *আগুন*, *ধাত্রীদেবতা*, *কালিন্দি*, *গণদেবতা*, *মন্বন্তর*, *কবি*, *বিংশ শতাব্দী*, *সন্দীপন পাঠশালা*, *ঝড় ও ঝরাপাতা*, *অভিযান*, *পদচিহ্ন*, *উত্তরায়ণ*, *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* প্রভৃতি উপন্যাস প্রকাশিত হতে থাকে। মধ্যবিত্ত সমাজ ও রাঢ়বঙ্গের নিখুঁত জীবনচিত্র পড়ে পাঠককুল রীতিমত রোমাঞ্চিত, মুগ্ধ ও বিস্মিত হন। এ সময়কালে তিনি অনেকগুলি স্মরণীয় গল্পও রচনা করেন। তারাশঙ্করের উপন্যাস, গল্প ও নাটক নিয়ে চল্লিশটিরও বেশি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। সত্যজিৎ রায় তাঁর *জলসাঘর* এবং *অভিযান* উপন্যাসের সফল চিত্ররূপ দিয়েছেন। এছাড়াও বিজয় বসু [*আরোগ্য নিকেতন*], তরুণ মজুমদার [*গণদেবতা*], তপন সিংহ [*হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*, *বেদেনি*] অজয় কর [*সপ্তপদী*]সহ টালিগঞ্জের বহু খ্যাত-অখ্যাত পরিচালক তাঁর রচনা চলচ্চিত্রে রূপায়িত করেছেন।

তিনি উপন্যাসের প্রচলিত লালিত্য ভেঙে তাঁকে বাস্তবের শক্ত জমিতে দাঁড় করিয়েছেন। সামাজিক টানাপড়েনের প্রেক্ষাপটে মানবিক সম্পর্কের গভীরে আলোকপাত করাই ছিল তাঁর কাজ। তাঁর কলম সমাজের রক্ষণশীলতা ও ভণ্ডামির বেড়াজাল ভেঙে সত্য উদ্ঘাটনে সতত তৎপর ছিল। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি সমাজকে দেখেছেন। তিনি এমন এক সময়ে লিখতে শুরু করেন যখন সামন্তবাদী সমাজকাঠামো ভেঙে পড়ছে, গড়ে উঠছে শিল্পকেন্দ্রিক নাগরিক সভ্যতা। ক্ষয়িষ্ণু জমিদারের জীবনকাহিনি উপজীব্য করে রচিত *জলসাঘর* এই ভাঙচুরের বিশ্বস্ত প্রতিলিপি। তারাশঙ্করের বিশেষত্ব এই, কল্পনা নয়– যা দেখেছেন তিনি তা-ই নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর লেখায় বিশেষভাবে পাওয়া যায় বীরভূম-বর্ধমান অঞ্চলের সাঁওতাল বাগদি বোষ্টম বাউরি ডোম গ্রাম্য কবিয়াল সম্প্রদায়ের কথা। ছোট বা বড় যে ধরনের মানুষই হোক না কেন, তারাশঙ্কর তাঁর সব লেখায় মানুষের মহত্ত্ব ফুটিয়ে তুলেছেন। এটি তাঁর লেখার সবচেয়ে বড় গুণ। সামাজিক পরিবর্তনের বিভিন্ন চিত্র তাঁর অনেক গল্প ও উপন্যাসের উপজীব্য। সেখানে আরও আছে গ্রাম জীবনের ভাঙনের কথা, নগর জীবনের বিকাশের কথা।

বাংলার বাইরে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করে তিনি ক্রমে সর্বভারতীয় পরিচিতি লাভ করেন। বিভিন্ন ভাষায় তাঁর বই অনূদিত হতে শুরু করে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে শরৎস্মৃতি পদকে ভূষিত করে। ১৯৫২ সালে তিনি বিধান পরিষদের সদস্য মনোনীত হন। এরপর ভারতের রাষ্ট্রপতির মনোনয়নে রাজ্যসভার সদস্যপদ লাভ করেন। *আরোগ্য নিকেতন* উপন্যাসের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৫৫ সালে তাঁকে রবীন্দ্রপুরস্কারে সম্মানিত করে। পরের বছর লাভ করেন সাহিত্য একাদেমি পুরস্কার। ১৯৫৭ সালে চিন সরকারের আমন্ত্রণে চিন ভ্রমণে যান। পরের বছর ভারতীয় লেখক প্রতিনিধিদলের নেতা হিসেবে যান সোভিয়েত ইউনিয়নে আফ্রো-এশীয় লেখক সমিতির আমন্ত্রণে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে জগত্তারিণী স্বর্ণপদকে ভূষিত করে। ১৯৬৬ সালে *গণদেবতার* জন্য তিনি জ্ঞানপীঠ পুরস্কার লাভ করেন। দেশে-বিদেশে নানা পুরস্কার-সম্মানে ভূষিত তারাশঙ্করকে ভারত সরকার পদ্মশ্রী ও পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত করেন।

প্রায় চল্লিশ বছরের সাহিত্যিকজীবনে তারাশঙ্কর ৬৫টি উপন্যাস, ৫৩টি গল্প সংকলন, ১২টি নাটক, ৪টি প্রবন্ধ সংকলন, ৪টি আত্মজীবনী ও ২টি ভ্রমণকাহিনি লিখে গেছেন। ১৯৭১ সালে বিশ্বভারতী ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যথাক্রমে নৃপেন্দ্রচন্দ্র ও ডি এল রায় স্মারক বক্তৃতা দান করেন। এবছরেরই ১৪ সেপ্টেম্বর ভোরে কলকাতায় নিজের বাড়িতে এই কালজয়ী কথাশিল্পীর মৃত্যু হয়।

• নিজস্ব প্রতিনিধি

উপরে ॥ ১৬ জুলাই ২০১৬ শিলংয়ে 'এশীয় নদীসঙ্গম উৎসব ২০১৬'-য় আইজিসিসি-র মণিপুরী নৃত্য শিক্ষক মিজ ওয়ার্দা রিহাবের নেতৃত্বে ১১-সদস্যের আইজিসিসি শিক্ষার্থীদলের নৃত্য পরিবেশন

নীচে ॥ ২৮ জুন ২০১৬ গুলশানের আইজিসিসি মিলনায়তনে বাংলাদেশের আইসিসিআর বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের জ্ঞাতকরণ ও বিদায় সংবর্ধনা

Regd. No. DA 355 Bharat Bichitra August 2016

ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা

জ্ঞাতব্য তথ্য

নতুন আইভিএসি কেন্দ্র

ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপলিকেশন সেন্টার (আইভিএসি)-এর মাধ্যমে ভারতীয় ভিসা আবেদন গ্রহণের জন্য ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকার স্বীকৃত এজেন্ট এস্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই) আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা দিচ্ছে যে, এখন থেকে ভিসার আবেদনপত্র গ্রহণ ও বিতরণের জন্য ঢাকার উত্তরাসহ বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুরে নতুন আইভিএসি খোলা হয়েছে।

কার্যক্রমকাল

রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার– আবেদনপত্র গ্রহণ সকাল ৮.০০টা থেকে দুপুর ১.০০টা।
রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার– আবেদনপত্র বিতরণ বিকাল ৩.০০টা থেকে সন্ধ্যা ৬.০০টা।

ঠিকানা

আইভিএসি-র সব কেন্দ্রে সব ধরনের ভিসা আবেদন গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশে এখন নিম্নোক্ত আইভিএসি কেন্দ্রে বিদ্যমান। এগুলো হচ্ছে: আইভিএসি, গুলশান, ঢাকা ॥ আইভিএসি, মতিঝিল, ঢাকা ॥ আইভিএসি, ধানমন্ডি, ঢাকা ॥ আইভিএসি, উত্তরা, ঢাকা ॥ আইভিএসি, চট্টগ্রাম ॥ আইভিএসি, সিলেট ॥ আইভিএসি, খুলনা ॥ আইভিএসি, রাজশাহী ॥ আইভিএসি, বরিশাল নর্থ সিটি সুপার মার্কেট দ্বিতীয় তলা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, অমৃতলাল দে রোড, বরিশাল (এলাকা: বরিশাল, বরগুনা, ভোলা, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী ও পিরোজপুর) ॥ আইভিএসি, ময়মনসিংহ, ২৯৭/১ মাসকান্দা দ্বিতীয় তলা, মাসকান্দা বাসস্ট্যান্ড, ময়মনসিংহ (এলাকা: জামালপুর, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, শেরপুর, টাঙ্গাইল ও ভালুকা) ॥ আইভিএসি, রংপুর, জে বি সেন রোড, রামকৃষ্ণ মিশনের বিপরীতে, মহিগঞ্জ, রংপুর (এলাকা: রংপুর, দিনাজপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও এবং লালমনিরহাট)। উল্লেখ্য, ঢাকার বাইরের এলাকার ভিসা আবেদন ঢাকার কোন কেন্দ্রে গ্রহণ করা হবে না।

ভিসা আবেদন করার সময় আবেদনকারীদের সঠিক বিভাগ নির্ধারণ করে আবেদন করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সব দলিল সঠিক, সম্পূর্ণ ও অবিকল হওয়া চাই। আবেদনকারীদের এজেন্ট ও মধ্যবর্তী মানুষদের ব্যাপারে সতর্ক থাকার এবং এসব ক্ষেত্রে নিকটতম থানা/আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে জানানোর পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। আইভিএসি বাংলাদেশে তার পক্ষে কাজ করার জন্য কোন ব্যক্তি/সংস্থাকে অনুমোদন দেয়নি।

পুনর্নির্ধারিত প্রক্রিয়া ফি

১ জানুয়ারি ২০১৫ থেকে পুনর্নির্ধারিত ভিসা প্রক্রিয়া ফি নিম্নোক্ত হারে কার্যকর হবে: ১. ঢাকার সব আইভিএসি কেন্দ্র– বাংলাদেশী টাকা ৬০০.০০। ২. আইভিএসি, চট্টগ্রাম– বাংলাদেশী টাকা ৬০০.০০ ॥ ৩. আইভিএসি, রাজশাহী– বাংলাদেশী টাকা ৬০০.০০ ॥ ৪. আইভিএসি, সিলেট– বাংলাদেশী টাকা ৭০০.০০ ॥ ৫. আইভিএসি, খুলনা– বাংলাদেশী টাকা ৭০০.০০ ॥ ৬. আইভিএসি, বরিশাল– বাংলাদেশী টাকা ৭০০.০০ ৭. আইভিএসি, ময়মনসিংহ– বাংলাদেশী টাকা ৭০০.০০ ॥ ৩. আইভিএসি, রংপুর– বাংলাদেশী টাকা ৭০০.০০।

আলোকচিত্র আপলোডের নতুন পদ্ধতি:

আবেদনকারীদের অনলাইন আবেদনপত্রে দেওয়া নির্ধারিত জায়গায় তাদের আলোকচিত্র স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে। স্ক্যানকৃত আলোকচিত্র ছাড়া আবেদনপত্র অসম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে।

হেল্পলাইনসমূহ

হেল্পলাইন টেলিফোন/ফ্যাক্স/ ই-মেইলসমূহ: ০০-৮৮-০২ ৮৮৩৩৬৩২২ ॥ ০০-৮৮-০২ ৯৮৯৩০০৬ ॥ ০০-৮৮-০১৭১৩ ৩৮৯৪৯৯ ০০-৮৮-০২ ৯৮৬৩২২৯ (ফ্যাক্স) ॥ visahelp@ivacbd.com. আরো সাহায্যের জন্য ই-মেইল: visahelp@hcidhaka.gov.in
ভিসা আবেদন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত যে-কোন ধরনের প্রশ্নের জবাব পেতে ভিজিট করুন: http://www.ivacbd.com/faq.php

জনস্বার্থে ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা কর্তৃক প্রচারিত